# দৃষ্টিকোণ

মর্তুজা আহম্মেদ

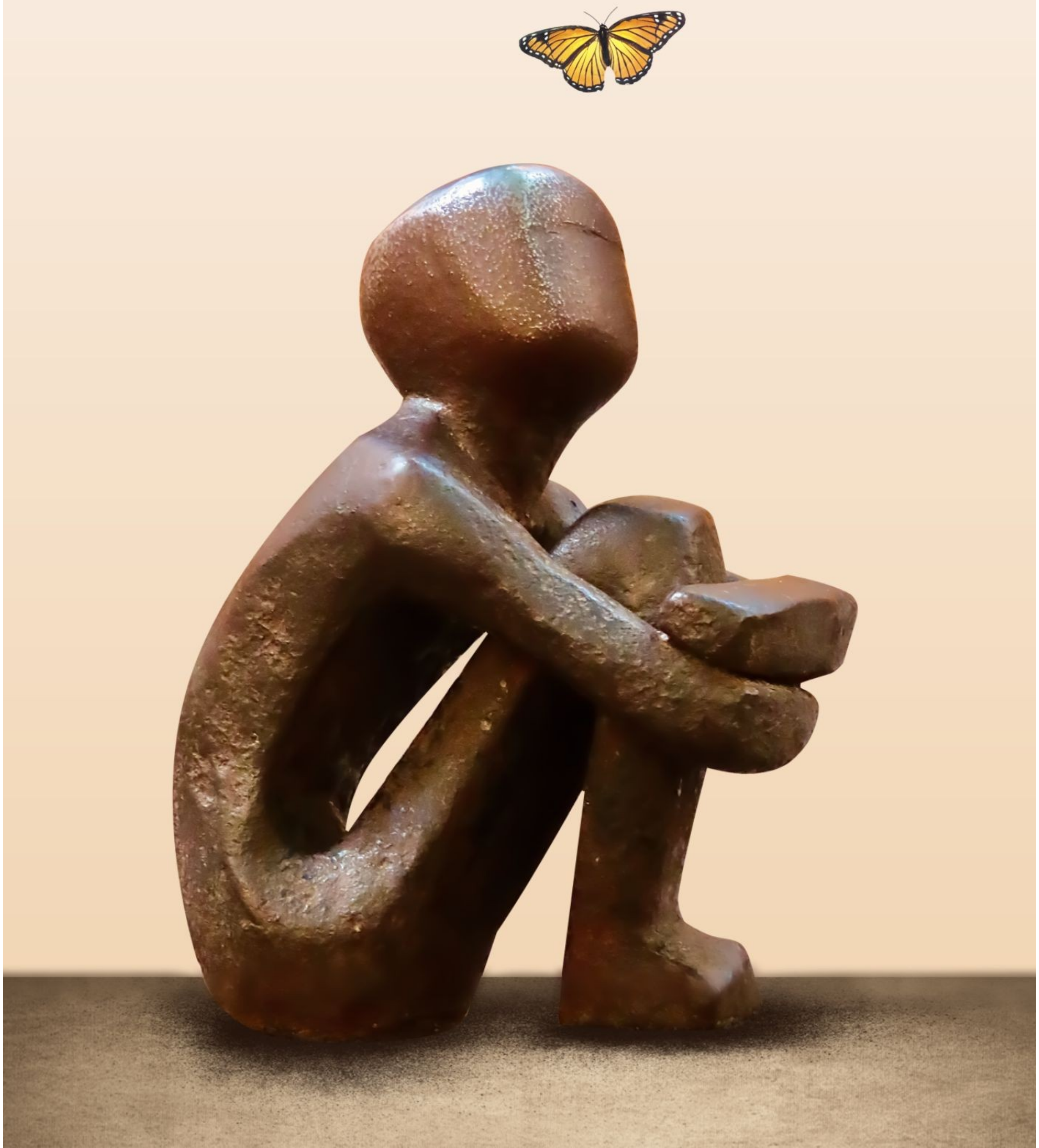

# দৃষ্টিকোণ

মর্তুজা আহম্মেদ

We can do anything we want to if we stick to it long enough.

-- Helen Keller

আমাদের জীবনে আমরা অনেক ঘটনার সম্মুখীন হই। বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসি। বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করি। অভিজ্ঞতাগুলো সবার ক্ষেত্রে এক রকম হয় না। কারও অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে তিক্ততা বেশি থাকে, কারও অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে তিক্ততা কম থাকে। আসলে তিক্ততা ও মধুরতা উভয় মিলিয়েই অভিজ্ঞতা পূর্ণতা পায়। আমরা বিভিন্ন লোকজনের সাথে চলাফেরা করে থাকি। এদের মধ্যে পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহকর্মী, বান্ধবী, শিক্ষক - শিক্ষিকা, নেতা, প্রতিবেশী, আত্মীয় এবং বিভিন্ন পেশাদার লোকজন উল্লেখযোগ্য। তারা প্রায়ই আমাদের কাছে মনোমুগ্ধকর, চাঙ্গায়নী, আত্মবিশ্বাসী এবং আরও বিভিন্ন উদ্দীপনা নিয়ে আবির্ভুত হয়। চলার পথে তাদের সাথে বিভিন্ন কথা-বার্তা ভাগাভাগি করা হয়। তাদের সাথে নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা হয়ে থাকে।

যখন আমাদের অন্যদের প্রতি ব্যবহারের দিকটি আসে মানে অন্য লোকদের সাথে যখন আমাদের নিজেদের আচরণের দিকটি সামনে আসে তখন আমরা অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে, আমরা অনেক সময় হঠাৎ করেই কোন কিছু না ভেবেই কাউকে এমন কথা বলে থাকি, যা আমাদের অনুশোচনার কারণ হয়। আমরা বুঝতে পারি না, ঠিক কোথায় থেকে ঐ রকম কথা বা আচরণের সৃষ্টি হয়। আবার আমরা এমন কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে যাই আমরা জানি যে ব্যক্তিটি আমাদের জন্য ঠিক না অথবা ব্যক্তিটির সাথে আমাদের সে রকম কোন মিল নেই, তাও প্রেমে না পড়ে পারিনা। আমাদের উপর কী চেপে বসে, আমরা অবাক হয়ে যাই। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা এমন কিছু আচরণের মধ্য দিয়ে যাই যা আমরা নিজে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। মনে হয় আমাদের মধ্যে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করে। সেই অদৃশ্য শক্তি আমাদের ঐ সময় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আমরা বলে থাকি অমুক ভালো নয়, তমুক আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তাই আমিও তার সাথে সে রকম ব্যবহার করেছি। সত্য হচ্ছে, আমরা মানুষ অন্যরা যা করে এবং অন্যরা যা বলে থাকে তার উপর কোন কিছু সেভাবে চিন্তা না করে হঠাৎ প্রতিক্রিয়া দেখাই। এমন যদি হয়, আমরা কোন আচরণ প্রকাশের পূর্বে বা কোন কিছু বলার পূর্বে মানুষের আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করি বা কোন সমস্যার গভীর পর্যন্ত যাই। যদি আমরা বুঝতে পারি, কেন কিছু লোক হিংসাত্মক হয় এবং আমাদের কাজে বাধা প্রদান করে। যদি বুঝতে পারি কেন কিছু লোক হঠাৎ অযৌক্তিক আচরণ করে এবং তাদের চরিত্রের কালো খারাপ দিকটি প্রকাশ করে। যদি আমরা সত্যিই মানুষের আচরণের মূল কারণ বুঝতে পারি, তাহলে আমরা সহজে দ্বিধাগ্রস্থ হব না। আমরা যৌক্তিক চিন্তা করতে সমর্থ হব। অন্যদের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে আমাদের নিজেদের তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে অপরিচিত ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে, তাকে বুঝতে হবে। আসলে সে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নয়, আমাদের নিজেরদেরই অংশ। যে আমাদের কল্পনার চেয়েও রহস্যময় ও জটিল। আমাদের নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। এই লেখাটিতে এমন কয়েকটি ঘটনা রয়েছে যেখান থেকে মানুষের কিছু আচরণ বুঝতে সাহায্য করবে।

পাঠকদের ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

**Creative Commons License**
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

# নতুন কিছু শেখা

যেগুলো আমরা অতীতে শিখেছি সেগুলোর অনেকাংশই আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সময় পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বাস যেগুলো সত্য ছিল, এখন মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়েছে। আগে আমরা যেভাবে কাজ করতাম এখন আর সেভাবে করি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন মানুষ নতুন আইডিয়া গ্রহণ করতে ভয় পায়। আমি তো পুরোনো আইডিয়াকে ভয় পাই। এই একুশ শতকে অজ্ঞ তারা না যারা পড়তে ও লিখতে পারে না, তারা যারা শিখতে পারে না। আজকাল বেশিরভাগ লোকজন বিভ্রান্ত ও বেশি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। আমাদের দেশের প্রায় বেশিরভাগ মানুষ আজকাল টিকটক এবং বিভিন্ন ধরণের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। মনে করুন, দিনের বেশিরভাগ সময় ধরে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ করেন। কখন আপনি নতুন কিছু করা বা শেখার চিন্তা করেন? আপনি কী সত্যিকার অর্থে আপনার জীবন উপভোগ করছেন? মানুষ হিসেবে আমাদের কঠিন জিনিসগুলো পরিত্যাগ করা এবং সহজ জিনিসগুলো গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে। তাই আমরা যেগুলো সহজ মনে হয় সেগুলোই গ্রহণ করি, হোক না ক্ষতিকর জিনিস।

প্রাচীন রোমানদের ভাষা ছিল লাতিন। রোম প্রতিষ্ঠিত হবার পর কিছু শতাব্দী ধরে রোমানরা অতোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাদের আবাসস্থল লাতিয়ামেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাদের যুদ্ধবাজ প্রতিবেশী দ্বারা ভীত থাকতো। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পর, যিশু খ্রীষ্টের পূর্বে রোমের শক্তি অতি দ্রুত বেড়ে গেল। রোম পুরো ইতালি দখল করলো। তারপর আস্তে আস্তে পুরো প্রাচীন বিশ্ব শাসন করা শুরু করলো। রোম সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো যা চারশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে ছিল। রোমান শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে লাতিন ভাষার গুরুত্ব বাড়তে শুরু করলো। পর্যায়ক্রমে ভাষাটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতালিতে ইতালিয়ান, স্পেনে স্প্যানিশ, এবং ফ্রান্সে ফ্রেন্স। এসব জাতিগুলো লাতিন ভাষারই আধুনিক রূপ ব্যবহার করছে। বিজয়ের সময়কালে এক সময় রোমানরা গ্রীকদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ায়। গ্রীকরা সৈন্য শক্তির দিক থেকে রোমানদের থেকে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে রোমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। তারা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, এবং দর্শনে উৎকৃষ্ট ছিল। রোমানরা যতক্ষণ না গ্রীকদের সংস্পর্শে আসে ততক্ষণ তারা এসব বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। গ্রীকরা তাদের জ্ঞান ও শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। যখন রোম তার সৈন্য শক্তি দিয়ে গ্রিস জয় করে, তখন গ্রিস তার বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা রোম দখল করে। আস্তে আস্তে রোমানদের এথেন্স এবং গ্রিসের অন্যান্য অংশে গিয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রথা হয়ে যায়। গ্রীক কবি, শিল্পী, বক্তা, এবং দার্শনিকরা রোমের দিকে ছুটতে থাকে এবং সেখানে তাদের শিল্প শেখাতে থাকে। গ্রীক সংস্কৃতি রোমে এমনভাবে প্রাধান্য পায় যে, এক সময় রোম তার নিজের সংস্কৃতি ভুলতে বসে। লেখকরা সবকিছু লাতিনে লিখতে শুরু করে। বিশ্ব জয়ের পর রোম তার ভাষা, আইন, জীবনযাপন, চিন্তা করার পদ্ধতি, এবং অন্যান্য সব কিছু দ্বারা অভিভূত হয়, এবং তারা নিজেদের সংস্কৃতিপূর্ণ রোমান দাবি করে। লাতিনই যোগাযোগ, জ্ঞান অর্জন, এবং অন্য সকল দৈনন্দিন কাজের একমাত্র ভাষা হয়ে যায়। বর্তমান যুগের ইংরেজি অভিধানের অর্ধেকের বেশি শব্দগুলো লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভুত।

রোমানরা গ্রীকদের কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করা শিখেছিল। যা তাদের উন্নতির শিখরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সমাজে কিছু লোকজন আছে যারা পরিবর্তনকে ভয় পায়। তারা পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে চায় না। আপনি চাইলেও তাদের সহজে পরিবর্তন করতে পারবেন না। কিন্তু সময়ের সাথে সবাইকে পরিবর্তিত হতে হয়। নতুন কিছু শিখতে হয়। নতুন কিছু কল্পনা করতে হয়। নতুন ভাবে চিন্তা করতে হয়। তা না হলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হয়। রোমানরা তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আজকাল বেশিরভাগ লোক সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর সময় নষ্ট করে। যা তাদের যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই আমাদের বুঝতে হবে আমরা কী চাই। আমাদের উচিত হবে যা আমাদের কাজে লাগে এমন কিছু শেখা। এমন কিছু নয়, যা শুধুই বিনোদনের খোরাক যোগায়।

২

# প্রলোভন

১৭৩০ সালে যখন জান পয়সঁ (Jeanne Poisson) কেবল নয় বছর বয়সের ছিলেন, তখন এক ভাগ্য পরীক্ষক তার ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন যে, তিনি রাজা লুই পনেরোর (Louis XV) উপপত্নী হবেন। এটি একটি হাস্যকর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কারণ পয়সঁ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ছিলেন। প্রথা ছিল, যারা রাজার উপপত্নী হবেন তারা অভিজাত পরিবার থেকে হবেন। তার বাবা ছিলেন অশালীন এবং অঙ্গীকারহীন প্রেমের জন্য কুখ্যাত। তার মা ধনী পুরুষদের মনরঞ্জন করতেন। সৌভাগ্যবশত তার মায়ের এক প্রেমিক তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল এবং তার পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাকে ছেলেদের মতোই সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তিনি গান গাওয়া, নৃত্য, ক্লাভিকর্ড বাজানো এবং আরও অন্য সব দক্ষতা আয়ত্ত করেছিলেন। নাট্যকার ক্রেবিলন (Crébillon) তাকে কথোপকথনের বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। জান পয়সঁ অনেক সুন্দরী ছিলেন। ১৭৪১ সালে তিনি বিয়ে করেন। তার মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি পরে সাহিত্যিক সেলুন খুলেন। সাহিত্যিক সেলুনগুলো সে সময় ফ্রান্সে অনেক বিখ্যাত ছিল। সাহিত্যিক সেলুন হলো একটি সামাজিক সভা বা গঠন, যেখানে সাহিত্য, শিল্প, এবং সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হতো। এই সেলুনগুলো সাধারণত একটি ব্যক্তিগত বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো এবং সেখানে লেখক, কবি, শিল্পী, এবং চিন্তাবিদরা একত্রিত হতেন। সেই সময়ের সকল মহান লেখক এবং দার্শনিকরা সেলুনে নিয়মিত আসতেন, অনেকেই সেলুনের মালিকের প্রতি মুগ্ধতার কারণে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভলেটয়র, যিনি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। জান পয়সঁ যদিও সফল হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই ভাগ্য পরীক্ষকের কথা ভুলতে পারেন নি। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন একদিন তিনি রাজার মন জয় করবেন। তার স্বামীর সম্পত্তি রাজা লুইয়ের প্রিয় শিকারস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। তিনি সেখানে মার্জিত ও আকর্ষণীয় পোষাক পরিহিত অবস্থায় বেড়ার আড়াল থেকে প্রায় রাজাকে লক্ষ্য করতেন এবং তার পথ অতিক্রম করার উপায় খুঁজতেন।

১৭৪৪ সালে যখন রাজার প্রাতিষ্ঠানিক উপপত্নী মারা গিয়েছিল, তখন সকল সুন্দরীরা তার জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাজা অপেক্ষা করছিলেন এবং সময় অতিবাহিত করছিলেন। তিনি জান পয়সেঁর সৌন্দর্য এবং কমনীয়তায় মুগ্ধ ছিলেন। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ঐ বছরেই তাকে প্রাতিষ্ঠানিক উপপত্নী বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে মারকুইস ডে পম্পাডুর উপাধি দেওয়া হলো। রাজার নতুনত্বের প্রয়োজন ছিল। একজন উপপত্নী তার রূপ দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সহজেই বিষণ্ন হয়ে যেতেন। তাই তার আরেক জনের কাছে যাবার প্রয়োজন হতো। সভাসদ বলেছিল, রাজার নতুন নারীর প্রয়োজন ছিল তাই জান পয়সঁকে বেছে নিয়েছেন। তারা ভেবেছিলেন রাজা কিছুদিন পর হয়তো তার উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু তারা জানতেন না, এই প্রলোভন জান পয়সেঁর মনে শেষ প্রলোভন ছিল না।

সময় অতিবাহিত হয়, রাজা তার উপপত্নীদের সাথে বেশি বেশি সাক্ষাত করা শুরু করেন। ভার্সাই প্রাসাদে রাজা যেন সুখ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাসাদের ঘরগুলো সব সময় গরম থাকতো এবং মনোরম সুগন্ধিতে ভরা থাকতো। ম্যাডাম ডে পম্পাডুর সব সময় ভিন্ন ধরণের পোষাক পরতেন। তিনি সুন্দর সুন্দর বস্তু ভালোবাসতেন। সূক্ষ্ম চিনামাটির বাসন, চীনা পাখা, সোনালী ফুলদানি ইত্যাদিতে তার ঘর ভরা থাকতো। যখনই রাজা তার সাথে দেখা করতে যেতেন নতুন কিছু খুঁজে পেতেন। তার রাজার প্রতি ব্যবহারে মাধুর্য ছিল। রাজা কখনই কোন নারীর সাথে সেভাবে মন খুলে কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু পম্পাডুর দক্ষতার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যেতেন। তার কণ্ঠ শ্রুতিমধুর ছিল। যখন আলাপচারিতা শেষ হবার দিকে যেত, তখন তিনি হয় পিয়ানো বাজাতেন না হয় তার মধুর কণ্ঠে গান গাইতেন। যখন রাজা বিষণ্ন হয়ে যেতেন, তখন ম্যাডাম ডে পম্পাডুর তার সাথে অন্য সব বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিতেন। যেমন, শহরের অট্টালিকাগুলো আরো সুন্দরভাবে তৈরি করা সম্ভব ইত্যাদি। তিনি তাকে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও অট্টালিকাগুলোর নকশার জন্য পরামর্শ দিতেন। ভার্সাই প্রাসাদে তিনি আমোদপ্রমোদ এর জায়গা এবং নাট্যশালায় যে সাপ্তাহিক নাটক অনুষ্ঠিত হতো তার দায়িত্ব নিতেন। সভা থেকে অভিনেতাদের বাছাই করা হতো। কিন্তু অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে ম্যাডাম ডে পম্পাডুর অংশগ্রহণ করতেন। তিনি

ফ্রান্সের সবচেয়ে ভালো অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন। রাজা নাট্যশালার প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। রাজা দর্শন এবং সাহিত্যের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করা শুরু করে দিয়েছিলেন। যে মানুষ শুধুমাত্র শিকার এবং জুয়ায় মনোযোগ

দিতেন, তিনি তার পুরুষ সঙ্গীদের সাথে কম থেকে কম সময় ব্যয় করা শুরু করলেন এবং শিল্পের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হওয়া শুরু করলেন।

সময় অতিবাহিত হওয়া শুরু হলো। রাজা তাকে ডাচেস বানিয়ে দিলেন। তার শক্তি ও প্রভাব সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিতে চলে গেল। তার অকাল মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ম্যাডাম ডে পম্পাডুর বিশ বছর ধরে দরবার এবং রাজার হৃদয় উভয় জায়গায় রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ১৭৬৪ সালে ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রাজার খুব জটিল হীনমন্যতা ছিল। রাজা লুই চৌদ্দ এর উত্তরসূরী হিসেবে তাকে সিংহাসনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে দুর্বল ছিলেন এবং তার শাসনকালে বিভিন্ন মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ম্যাডাম ডে পম্পাডুর, প্রলোভনের প্রতিভা, রাজার সুন্দরী নারীদের প্রতি আকর্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল, রাজার একঘেয়েমি দূর করা। রাজাদের ক্ষেত্রে বিষণ্ন হওয়া খুব সহজ ছিল। কারণ তারা যখন যা চাইতেন সহজেই পেয়ে যেতেন। ম্যাডাম ডে পম্পাডুর রাজার জীবনের সকল প্রকার কল্পনা ও অস্থিরসংকল্পতা তার চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার অনেক দক্ষতা ও প্রতিভা ছিল। প্রয়োজন অনুসারে তিনি সেগুলোকে তার সামনে শৈল্পিকভাবে স্থাপন করেছেন। রাজার পূর্ববর্তী উপপত্নীরা শুধু তার ইন্দ্রিগত চাহিদা পূরণ করেছিল। কিন্তু পম্পাডুরের মধ্যে রাজা ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্য উপপত্নীর জায়গা আরেক উপপত্নী দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেত, কিন্তু রাজা ম্যাডাম ডে পম্পাডুরের মতো অন্য কাউকে পেতেন না।

বেশিরভাব মানুষ বিশ্বাস করে যে, তারা বাইরের দিকের চেয়ে ভিতরের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী। তারা অবাস্তব আদর্শে পূর্ণ। তারা শিল্পী, চিন্তাবিদ, নেতা, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হতে পারে, কিন্তু বিশ্ব তাদের চূর্ণ করেছে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রলুব্ধ করে রাখার মূল চাবিকাঠি এটিই। একজন আদর্শ প্রেমিক জানে, কীভাবে এই ধরণের জাদু তৈরি করতে হয়। তাদের উচ্চাভিলাষী, আধ্যাত্মিক  ও উন্নত অনুভব করতে দিতে হয়। তাদের মধ্যে সুপ্ত যে প্রতিভা রয়েছে সেটিকে চিনতে হয়। প্রয়োজন মতো তাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারলেই তাদের মন জয় করা সম্ভব হয়। যেমনটি ঘটেছিল রাজা লুই পনেরোর ক্ষেত্রে। ম্যাডাম ডে পম্পাডুর তাকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের জীবনে ঠিক এমন কিছু পুরুষ বা নারী আসে যারা প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা রাখে। তারা অনেক বিপদজনক হয়। তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের দুর্বল দিকটি খুঁজে নেয় এবং তাদের কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। আমাদের উচিত এসব মানুষদের তৈরি করা ফাঁদে  পা না দেওয়া। তারা আমাদের বাহিরের দিকের চেয়ে ভিতরের দিকটি বেশি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। আমাদের মধ্যে যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটি তারা খুঁজে বেড়ায়। তারা আমাদের তাদের মোহে পড়তে বাধ্য করে। তাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাদের মার্জিত ব্যবহার। তাদের সেই মিষ্টি, মার্জিত, সুন্দর ব্যবহারের পিছনে লুকিয়ে থাকে অন্য এক ব্যক্তি, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

৩

# মনোভাব

অ্যান্টন চেখভ (Anton Chekhov) একজন প্রখ্যাত রুশ নাট্যকার ও গল্পকার। শৈশবে প্রত্যেক সকালে এই ভয়ে থাকতেন যে, তিনি তার বাবার কছে থেকে প্রহারিত হবেন নাকি বেঁচে যাবেন। যখনই তিনি সময় পেতেন, শহরে ঘুরতে বের হতেন। টাগানরগ (Taganrog) বেড়ে উঠার জন্য একটি ভয়াবহ জায়গা ছিল। প্রায় সব বাড়ির সামনের অংশ ক্ষয়িষ্ণু এবং ভেঙে পড়েছিল। রাস্তাগুলো বাঁধানো ছিল না। তুষার গলে গেলে সর্বত্র কাদার সৃষ্টি হতো। বিশাল বিশাল গর্ত ছিল যেগুলো একটি শিশুকে ঘাড় পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারতো। রাস্তায় আলো ছিল না। একমাত্র শান্তির জায়গা ছিল কবরস্থান। সেখানে চেখভ প্রায় ঘুরতে যেতেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিশ্ব ও নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে কল্পনা করতেন। তিনি কী সত্যিই এতোটাই মূল্যহীন ছিলেন যে, তার বাবার কাছে থেকে প্রতিদিন তাকে প্রহারিত হতে হতো ? তিনি চিন্তা করতেন। তার বাবা মুদি দোকানদার ছিলেন। ধর্মীয় ভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্রেতাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। তিনি একজন মাতাল, অলস ও অসৎ ব্যক্তি ছিলেন। টাগানরগ এর বাসিন্দারাও একই রকম কপট ও ভন্ড ছিলো।

তিনি তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি দেখতেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো, তখন সবাই ধার্মিক সাজার ভান ধরতো। তারা সমাধিক্ষেত্রে যেত এবং একে অপরে খাবারের ব্যাপারে বলা বলি করতো যে, মৃত ব্যক্তিটির বাড়িতে খাবারের কেমন আয়োজন হয়েছে। তিনি আস্তে আস্তে পরিবারের এক হাস্যকর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি শহরের বাসিন্দাদের নকল করার চেষ্টা করতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কাহিনী আবিষ্কার করতেন। কখনও কখনও তার মেজাজ আক্রমনাত্মক হয়ে  উঠতো। তিনি পাড়ার শিশুদের সাথে রসিকতা করতেন। যখন তার মা তাকে বাজারে পাঠিয়ে দিতেন তিনি বাজারে দুষ্টামো করতেন। বাজার থেকে কেনা হাঁস-মুরগীর উপর অত্যাচার চালাতেন। তিনি ক্রমশ অলস থেকে অলস হয়ে উঠছিলেন। ১৮৭৫ সালে চেখভ পরিবারের সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। তার বাবার সাথে সমস্যার কারণে দুই বড় ভাই আলেক্সান্ডার ও নিকোলাই বাড়ি ছেড়ে মসকো যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। একজনের ইচ্ছা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া, আরেকজনের শিল্পী হওয়া। এ সিদ্ধান্ত তার বাবাকে ক্ষুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের আটকাতে পারেন নি। তার বাবার পক্ষে মুদি দোকান সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। তারা প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এক প্রকার অবহেলিত ও বঞ্চিত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল চেখভের। চেখভ পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিলেন  এবং নিজের খেয়াল নিজে রাখতে শুরু করলেন। আলেক্সান্ডার চিঠিতে লিখে যে, তাদের বাবা আবার তাদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ করেছে। ছোট ছেলে মিকাইল অকর্মণ্য ও বিষণ্ন হয়ে গেছে। চেখভ চিঠির উত্তরে লিখেন,  বাবাকে দোষ দেওয়া বন্ধ করো এবং তোমার নিজের খেয়াল নিজে রাখার চেষ্টা করো। তিনি মিকাইল কে লিখেন, কেন তুমি নিজেকে মূল্যহীন ভাবছো? মূল্যহীন শুধুমাত্র একজনের সামনে ভাবা উচিত। তিনি হলেন ঈশ্বর। কিন্তু কোন মানুষের সামনে  নয়। মানুষদের সামনে তোমার মূল্য বজায় রাখা উচিত।

অ্যান্টন যে নিজে একথাগুলো লিখেছেন, ভেবে তিনি অবাক হয়ে যান। কয়েক মাস পরের ঘটনা। অ্যান্টন টাগানরগের রাস্তায় ঘুরছিলেন। হঠাৎ করেই তার পিতা-মাতার প্রতি চরম ভালোবাসা এবং সহানুভূতি জেগে উঠে। এটির কোথায় থেকে উদয় হয় তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি কখনও  এ রকম অনুভব করেন নি। তারপর থেকে তিনি তার বাবার সম্পর্কে গভীর ভাবে ভাবা শুরু করেন। তিনি ভাবলেন, সকল সমস্যার জন্য কী তার বাবাকে দোষ দেওয়া উচিত ?  কয়েক প্রজন্ম ধরে তারা ভূমিদাসের জীবন অতিবাহিত করে আসছেন। যদিও তাদের পরিবারের দাসত্ব গ্রহণ ছিল না, তবুও তার বাবা হৃদয় থেকে একজন দাসই ছিলেন। তার বাবা তাকে মারতো, তাই তিনি তার ছেলেদের মারতেন। স্থানীয় কর্মকর্তা ও ভূমির মালিকদের সামনে তিনি মাথা নত হতেন এবং তাদের হাতে চুম্বন করার অভ্যাস তার ছিল। অ্যান্টন লক্ষ্য করলেন যে, তিনি এবং তার ভাইরা একই ধারায় বয়ে যাচ্ছেন। তিক্ততা, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, তাদের ক্রোধ অন্যদের উপর দেখানো ইত্যাদি। যেহেতু তিনি একাই ছিলেন এবং নিজের খেয়াল নিজে রাখছিলেন, সেহেতু তিনি এসব সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি তার অতীত এবং বাবা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

যখন তিনি টাগানরগের রাস্তায় হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ করেই তার আবেগ থেকে উত্তরটি চলে এলো। তার বাবাকে বোঝার পর, তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারছিলেন। বরং তাকে ভালোবাসতে পারছিলেন। তার বাবা কোন অত্যাচারী শাসক ছিলেন না বরং তিনি একজন অসহায় বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। পরে তার বাবার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়, এবং তিনি তার অতীতের ব্যবহার ভুলে যান। তিনি তার বাবার ও তার জমানো টাকা ব্যবহার করে অন্য এক বড় বাড়িতে চলে যান। তিনি তার পরিবারের সকল দিক থেকে উন্নতির জন্য কাজ করা শুরু করে দেন। তিনি তার ভাই ও বোনদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনেন। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হয়। তারা তাদের বাবাকে পাপা অ্যান্তোসা বলা শুরু করেন। যার অর্থ হলো পরিবারের নেতা। আত্ম-করুণা এবং সব ক্ষেত্রে অভিযোগ করা তাদের মধ্য থেকে চলে যায়। চেখভ তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও দায়িত্ব নেওয়া শুরু করেন। তার ছোট ভাই আলেকজান্ডার, যে একজন মাতালে পরিণত হয়েছিল, তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। তার সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করেন।

পরবর্তীতে অ্যান্টন চেখভ বিখ্যাত লেখক হিসেবে পরিচিতি পান। চেখভের লেখার শৈলী সাধারণত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীর এবং তার চরিত্রগুলো প্রায়ই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। তিনি মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছেন, যা তার কাজগুলোকে আজও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

আমরা যখন কোন খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ি, তখন মনে করি পৃথিবীর যত দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র আমাদের উপরই ভর করে। আমরা মনে করি আমাদের পরিস্থিতির আর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। অন্যদেরকে দোষারোপ করা শুরু করি। দেশকে দোষারোপ করি, নিজের পরিবারকে দোষারোপ করি। আসলে বুঝি না যে, কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। সময় পরিবর্তনশীল। যেকোন সময় যে কারও অবস্থার পরিবর্তন হয়। আমরা যে সময়টিকে সুখের সময় মনে করি আসলে সেটিও সব সময় সুখের থাকে না। আবার দুঃখের সময়ও সব সময় দুঃখের থাকে না। আসলে সুখ বা দুঃখ বলে আমরা যা মনে করি তা হলো দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের মস্তিষ্ক নিজের মতো করে সময়গুলোকে সুখের বা দুঃখের করে নেয়। আপনি আপনার পরিস্থিতিকে যেভাবে দেখবেন, আপনার মস্তিষ্ক ঠিক সেভাবে আপনার নিকট উপস্থাপন করবে। আমাদের উচিত যেকোন পরিস্থিতিতে ভালো চিন্তা করা এবং কোন সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করে তার সমাধানের চেষ্টা করা, যেমনটি অ্যান্টন চেখভ করেছিলেন। তিনি যদি সেভাবে চিন্তা না করতেন, তাহলে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারতেন না। তার ভিতরের লেখককে জাগিয়ে তুলতে পারতেন না। আমরা অনেক সময় আমাদের পরিবারকে দোষারোপ করি যে, কেন এমন পরিবারে আমাদের জন্ম হলো, কেন আমি পরিবার থেকে সেভাবে সাহায্য পাই না ইত্যাদি। কিন্তু একবার চিন্তা করুন, তারাও আপনার মতোই পরিস্থিতির শিকার। আপনাকে বিষয়টি বুঝতে হবে। বুঝে আসল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, চেষ্টা করার বিকল্প নেই।

*Unfortunately there is no doubt about the fact that man is, as a whole, less good than he imagines himself or wants to be. Everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual’s conscious life, the blacker the denser it is.*

*---- Carl Jung*

৪

# ভালোবাসা

প্রেম বা কল্পনাপ্রবণ ভালোবাসা হলো ভালোবাসার অনুভূতি বা অন্য ব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ আর সেই সামগ্রিক অনুভূতি এবং আবেগ প্রকাশ করার জন্য ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত প্রণয় আচরণ । প্রেম জিনিসটা ঘুরেফিরে সবার জীবনেই কমবেশি আসে। বলা হয়, 'হৃদয় আছে যার সেই তো ভালোবাসে, প্রেম সবার জীবনেই আসে।' যখন যেভাবেই আসুক, যতবারই আসুক, প্রথম প্রেম একটা সুন্দর অনুভূতির নাম। বেশির ভাগ অভিজ্ঞতা বলে, প্রথম প্রেম টেকে না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেমেই বিয়ে, বিয়ের পর সুখী সংসার। অনেকে সংসার জীবনে যাওয়ার পর বলেন, না আরেকটু ভেবে বিয়ে করা উচিত ছিল। আবার অধিকাংশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা আরও পরের প্রেম একটি সুখী দাম্পত্য জীবন এনে দেয়। আবার অনেকে প্রথম প্রেমে ধাক্কা খাওয়ার পর দ্বিতীয় সম্পর্কে জড়ান মানসিক সুস্থতার জন্য। সেখানেও সুখী থাকলেও প্রথম প্রেমকে মনে মনে লালন করেন গভীর মমতায়। অনেকে ঘুরে ফিরে প্রথম প্রেমের মানুষের কাছে ফিরে আসেন, পূর্বের তিক্ততা ভুলে, একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করেন নিজেদের মধ্যে। আবার অনেকের এই ফিরে আসার অভিজ্ঞতা আগের থেকেও তিক্ত হয়।

প্রেম মানুষের অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থার নাম, যা কারো প্রতি আবেগ, গভীর অনুভূতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রেম বলতে যা প্রচলিত হয়ে গেছে, তা নিছক একটি অবৈধ সম্পর্ক। যে সম্পর্ক মানুষকে পাপের অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। ইতালির পিজাতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম প্রেম সত্যিই ব্যক্তির ভাবনার পরিবর্তন ঘটায়। পিজা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডোনাটেলা মারাজ্জিতি ২০ জন সদ্য প্রেমে পড়া যুগলের ওপর একটি গবেষণা চালান। এই গবেষণায় তিনি যাদের সম্পর্কের বয়স ছয় মাসেরও কম, তাদের আহ্বান জানান। গবেষণায় তিনি দেখতে চেয়েছেন যে সারাক্ষণ ভালোবাসার মানুষটির কথা ভাবার ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কেমন হতে পারে। গবেষণায় মারাজ্জিতি ছেলে-মেয়েদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন, সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণীদের ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তের সেরোটোনিনের পরিমাণ একই মাত্রায় রয়েছে। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে তার মনের মানুষকে না দেখে থাকতে পারে না। সে দূরে থাকলেও কমপক্ষে তার ছবি দেখে, অথবা তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে, কমপক্ষে তাকে নিয়ে স্বপ্নের বাসরে হারিয়ে যায় । কারো প্রতি সত্যিই দুর্বলতা চলে এলে, পারিবারিকভাবে তাকে বিয়ে করে নেওয়া উচিত। বিয়ে করার দৃঢ় সংকল্প থাকলেও কোনো বেগানা নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। আর বেশির ভাগ প্রেমের শেষ পরিণতিই হয় বিচ্ছেদ, ধোঁকা। এটি শয়তানের মরীচিকা।

সত্য প্রেম বা ভালোবাসা হয় পবিত্র । এটির মধ্যে পবিত্রতা লক্ষ্য করা যায় । মানুষ যখন কোন মানুষের প্রেমে সত্যিকার অর্থে পড়ে, তখন অসম্ভব কাজও সম্ভব করে ফেলে । আসলে সত্যিকার ভালোবাসার অনেক শক্তি রয়েছে ।

সময়টা ছিল ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দ। সম্রাট শাহজাহানের বয়স তখন ২০ বছর। একদিন আগ্রার বাজার দিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ শাহজাহানের চোখ চলে যায় পরমা সুন্দরী এক মেয়ের দিকে। আরজুমান্দ বেগম নামের মেয়েটির বয়স ১৫। প্রথম দেখাতেই আরজুমান্দ বেগমকে ভালো লেগে যায় শাহজাহানের। পরবর্তীতে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে মমতাজের বিয়ে হয় যুবরাজ খুররমের (সম্রাট শাহজাহান) সঙ্গে। (কিন্তু উইকিপিডিয়ায় বলা আছে বিয়ের সময় তাদের দুজনের বয়স ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ১৪)। তবে এর আগে রাজনৈতিক কারণে পারস্যের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন সম্রাট শাহজাহান। পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন মমতাজ মহল।মমতাজই ছিলেন শাহজাহানের সব চেয়ে প্রিয় বেগম । উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে মমতাজের মোট চোদ্দটি সন্তান হয়। মমতাজ মহল ১৬৩১ সালে ৩৯ বছর বয়সে বুরহানপুরে ১৪তম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। স্ত্রী হারানোর শোকে মুহ্যমান শাহজাহান তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর স্মৃতির জন্য নির্মাণ করেন ভালবাসার  অপরূপ নিদর্শন তাজমহল । স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাতদিন সাতরাত শাহজাহান কিছু খান নি। ঘর থেকেও বের হন নি।

এটি ছিল তার স্ত্রী মমতাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা । তাকে তিনি অনেক ভালোবাসতেন । তাই তো তার ভালোবাসার নিদর্শন সরূপ নির্মাণ করেন তাজমহল । যা আজও ভালোবাসার স্মৃতি বহন করে চলেছে । রাজ কোষাগারের অঢেল অর্থ খরচ করে , প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক দিয়ে তৈরি হয়েছিল তাজমহল । অন্যদিকে ফাল্গুনির প্রতি ভালোবাসার জন্য ভারতের বিহারের গেহলরের সহায় সম্বলহীন দশরথ মাঝি বাইশ বছর ধরে একাই কেটে গেছেন পাথুরে পাহাড় ।

ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত গেহলর গ্রামটিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মস্ত এক পাহাড়। পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে পার্শ্ববর্তী শহরে যেতে গ্রামবাসীকে পাড়ি দিতে হয় প্রায় ৫৫ কিলোমিটার পথ। এ পাহাড়কে নিয়তি হিসেবেই মেনে নিয়েছেন সবাই। তিনশ ফিট উঁচু এ পাথুরে পাহাড় ছাড়াও গেহলরকে ঘিরে আছে আরো অনেক অভিশাপ। পাহাড়ের এপারে বেশীরভাগ অধিবাসীই 'নীচুজাতের'। জাতভেদ প্রথার প্রকটতার কারণে তাই তারা বঞ্চিত তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ থেকেও। পাহাড়ের এপারে পানি, বিদ্যুৎ সুবিধা তো দূরের কথা, নেই কোনো স্কুল বা হাসপাতালও। সবচেয়ে কাছের হাসপাতালটির দূরত্বই প্রায় সত্তর কিলোমিটার।

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত এ গ্রামেই শুরু হয় দশরথ ফাল্গুনির ভালোবাসার গল্প। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। অধিকাংশ গ্রামবাসীর মতোই দশরথ কাজ করেন পাহাড়ের অপর পার্শ্বে। কাজ করতে করতে মাঝ দুপুরে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন কারো অপেক্ষায় চোখ মেলে দেন দূরের পথের দিকে। এ সময় মুখে হাসি মেখে, কাঁখে কলসি ভর্তি পানি আর খাবার নিয়ে হাজির হন ফাল্গুনি। দশরথের মরুভূমির ন্যায় জীবনে যেন পাহাড়ের বাঁক ধরে নেমে আসে এক টুকরো স্নিগ্ধ ছায়া।

সেদিনও ফাল্গুনির জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন দশরথ। কিন্তু ফাল্গুনির আসতে দেরী হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে তার। পাহাড়ের যে পথ ধরে গ্রামবাসীরা এ মাঠে আসেন সেটি খুবই বিপদজনক। একবার পা হড়কে গেলে আর রক্ষা নেই। দুর্ঘটনার আশঙ্কা উঁকি দিতে শুরু করে দশরথের মনে। এ সময় দৌড়ে সেখানে এসে হাজির হয় গ্রামবাসীদের একজন। খবর দেয় সত্য হয়েছে দশরথের আশঙ্কাই। তার জন্য খাবার নিয়ে আসার সময় পাহাড়ে পা পিছলে ভীষণ রকম আহত হয়েছেন ফাল্গুনি। যত দ্রুত সম্ভব নিতে হবে ডাক্তারের কাছে। কিন্তু হাসপাতাল যে সত্তর কিলোমিটার দূর।

হাসপাতাল নেয়ার সময় পথেই মারা যান তিনি। এলোমেলো হয়ে যায় দশরথের নিত্যকার জীবন, হারিয়ে যায় তার জীবনের একমাত্র ভালবাসাটুকুও। পাহাড়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভে বিষিয়ে উঠে তার অন্তর। পালের শেষ ছাগলটিও বেচে দিয়ে কিনলেন হাতুড়ি আর শাবল । এ পাহাড় যেন আর কারো প্রাণ নিতে না পারে তাই সিদ্ধান্ত নিলেন একাই এ পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করবেন তিনি। এমন অসম্ভব কল্পনা কোনো পাগল ছাড়া কেউ করতে পারে না বলে হেসেই উড়িয়ে দেয় সবাই। কিন্তু দশরথ তার সঙ্কল্পে অটুট।

তার দিনমজুরির কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ রূপে মন দিলেন পাহাড় খোঁড়ার কাজে। খেয়ে না খেয়ে, রাত-দিন এক করে চলতে থাকে তার সংগ্রাম। এ সময় তিনি মাঝে মাঝে মানুষের বিভিন্ন জিনিস পাহাড় পার করে দিতেন। এ থেকে প্রাপ্ত সামান্য অর্থ দিয়েই কোনোমতে চলতো তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ। আর চলতো দশরথের পাহাড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এভাবে এক দিন, দু'দিন নয়, কেটে যায় বছরের পর বছর। এর মধ্যে একবার ভীষণ খরার কারণে গ্রামবাসীদের অনেকেই গেহলর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। তার বাবা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাদের সাথে শহরে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যাননি দশরথ মাঝি।

প্রায় দশ বছর চলে যায়। দশরথের বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রমের ফলে পাথুরে পাহাড়ের গায়ে দেখা দেয় চিড়। এ সময় তার গ্রামের কেউ কেউ এগিয়ে আসেন তাকে সাহায্য করতে। মাঝে মাঝে খাবার এবং যন্ত্র কিনে দিয়ে সহায়তা করতেন তারা। দশরথ পাহাড় কাটা শুরু করেছিলেন ১৯৬০ সালের দিকে। এর প্রায় বাইশ বছর পর ১৯৮২ সালে একদিন তিনি তার পথ থেকে সরান শেষ পাথরটি । পাহাড়ের বুক চিরে তখন তৈরি হয়েছে ৩৬০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া একটি পথ।

পরবর্তীতে যার নাম হয় 'দশরথ মাঝি রোড'। এর ফলে আগে যেখানে পৌঁছানোর জন্য মানুষের পাড়ি দিতে হতো ৫৫ কিলোমিটার পথ, এখন সেই দূরত্ব নেমে এসেছে মাত্র ১৫ কিলোমিটারে। তবে এখানেই শেষ হয়নি দশরথ মাঝির সংগ্রাম।

এ রাস্তাকে মেইন রোডের সাথে সংযুক্ত করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে দিল্লী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দিল্লী যাওয়ার মতো আর্থিক সংগতি তার নেই। যে মানুষ বাইশ বছর ধরে পাহাড় ভাঙতে পারে তার কাছে এ আর এমন কি! তিনি পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দেন বিহার থেকে দিল্লী। পথে যেতে যেতে সকল স্টেশন মাস্টার এর কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন তিনি। কিন্তু দিল্লীতে গিয়ে দেখা করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রীর সাথে।

পরবর্তীতে তিনি বিহারের প্রাদেশিক সরকার প্রধানের সাথে দেখা করেন। নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দশরথ মাঝিকে সেখানে বসিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন রাজ্যপ্রধান নিতেশ কুমার। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে ৫ একর জমি দেয়া হয় তাকে। কিন্তু যার জীবনের এতটা বছর কেটে গেছে মানবতার কল্যাণে তিনি কি আর নিজের জন্য ভাবেন! সেই জমিটুকু তিনি দান করে দেন হাসপাতাল তৈরির জন্য। সেখানে এখন তার নামে গড়ে উঠেছে হাসপাতাল। ২০০৬ সালে বিহার সরকার ভারতের সবচেয়ে সম্মানজনক পদকগুলোর একটি 'পদ্মশ্রী পদকের' জন্য প্রস্তাব করেন দশরথ মাঝির নাম।

আসলে সত্যিকারের ভালোবাসা  এখনকার যুগের ছেলেমেয়ে বোঝে না । তারা ভালোবাসার নামে বিভিন্ন অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরে । তারা এটাকে ভালোবাসা মনে করে । মানুষ যাকে প্রকৃত অর্থেই ভালোবাসে তার জন্য যেকোন কিছু করতে প্রস্তুত থাকে । অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে । তবে মানুষ যে শুধু মানুষকেই ভালোবাসবে এমনতো না । মানুষ তার কাজকে ভালোবাসে, ভালোবাসে প্রকৃতি, পশু-পাখি আরও অন্য কিছু । তবে ভালোবাস হতে হবে পবিত্র । যার মধ্যে কোন ভেজাল থাকবে না । তবেই না ভালোবাসা সঠিক অর্থে ভালোবাসা হবে ।

ভালোবাসা হলো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি। এটা আমাদের বাঁচতে শেখায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায় এবং ভালো মানুষ হতে উৎসাহিত করে। তাই, ভালোবাসুন এবং ভালোবাসায় বাঁচুন।

৫

# কম কথা বলা

গনিয়াস মারসিয়াস (Gnaeus Marcius) যাকে কোরিওলানাস বলা হয়, যিনি প্রাচীন রোমান সেনাপতি ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করেছিলেন এবং শহরকে বিভিন্ন সময় দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন। কারণ তিনি তার বেশিরভাগ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাতেন। খুব কম রোমান তাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতো। তিনি একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ৪৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কোরিওলানাস চিন্তা করলেন তার এই খ্যাতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত। তিনি রোমের কনসালের উচ্চ পদের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐতিহ্যগতভাবে এই পদের প্রার্থীরা প্রতিযোগিতার শুরুতেই জনসমক্ষে ভাষণ দিতেন। তিনি রোমের জন্য সতেরো বছর ধরে যুদ্ধ করে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রদর্শন করে তার ভাষণ শুরু করেছিলেন।

জনতার মধ্যে খুব কম লোকই পরবর্তী দীর্ঘ বক্তৃতাটি শুনেছিল; তার বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের প্রমাণস্বরূপ, সেই ক্ষতচিহ্নগুলি জনতার চোখে জল এনে দিয়েছিল। তার নির্বাচন নিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল। নির্বাচনের দিন আসলো। তিনি পুরো সিনেট এবং অভিজাতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ফোরামে প্রবেশ করেন। নির্বাচনের দিনে এমন ঝলমলে প্রদর্শন দেখে সাধারণ জনগণ বিরক্ত হয়ে পড়েন। এরপর কোরিওলানাস আবার বক্তৃতা দেন, যার বেশিরভাগই ছিল তার সাথে আসা ধনী নাগরিকদের উদ্দেশ্য করে। তার বক্তৃতা দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিল। ভোটে নিশ্চিত জয় দাবি করে, তিনি তার যুদ্ধক্ষেত্রের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করেছিলেন। তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ অভিযোগ করেছিলেন। এইবার জনগণ তার কথা শুনলো। তারা বুঝতে পারেনি যে এই কিংবদন্তি সৈনিকও একজন সাধারণ দাম্ভিক। কোরিওলানাসের দ্বিতীয় ভাষণের খবর দ্রুত রোমে ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি যাতে নির্বাচিত না হন এজন্য জনগণ প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত হলো। কোরিওলানাস পরাজিত হলেন। এরপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান এবং তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া সাধারণ জনগণের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন।

কয়েক সপ্তাহ পর রোমে জাহাজে করে খাবারের একটি বড় চালান এসে পৌঁছায়। সিনেট সেই খাবার জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য চিন্তা করছিল। এই সিদ্ধান্তের উপর যখন একে অপরে মতামত দেওয়া শুরু করেছিল, তখন কোরিওলানাস এসে সিনেটের মঞ্চে উঠলেন। তিনি বললেন যে, এই বিতরণ পুরো শহরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। বেশ কয়েকজন সিনটরের মতামত গৃহীত হয়েছিল এবং এই বিতরণের সিদ্ধান্ত সন্দেহের সম্মুখীন হয়েছিল। কোরিওলানাস থামনেন নি। তিনি গণতন্ত্রের ধারণার নিন্দা করতে থাকলেন। তিনি জনপ্রতিনিধিদের, ট্রিবিউনদের অপসারণ এবং শহরের শাসনভার প্যাট্রিশিয়ানদের হাতে তুলে দেবার পক্ষে ছিলেন। যখন কোরিওলানাসের সর্বশেষ বক্তৃতার কথা জনগণের কাছে পৌঁছালো, তখন তাদের ক্রোধের সীমা রইল না। ট্রিবিউনদের সিনেটে পাঠানো হলো যাতে কোরিওলানাস তাদের সামনে উপস্থিত হন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরে শহরজুড়ে দাঙ্গা পড়লো। জনগণের ক্রোধের ভয়ে সিনেট অবশেষে শস্য বা খাবার বিতরণের পক্ষে ভোট দিলো। ট্রিবিউনদের শান্ত করা হয়েছিল, কিন্তু জনগণের দাবি ছিল যে কোরিওলানাস তাদের সাথে কথা বলুক এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুক। জনগণ চেয়েছিল, যদি তিনি অনুতপ্ত হোন এবং তার মতামত নিজের কাছে রাখতে রাজি হোন, তাহলে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে। কোরিওলানাস শেষবারের মতো জনগণের সামনে উপস্থিত হলেন, জনগণ তার কথা নীরবে শুনতে থাকলো। তিনি শুরুতে মৃদুভাবে কথা বললেও, তার বক্তৃতা যত এগোচ্ছিল, ততই তিনি আরও কড়া ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন। আবারও তিনি অপমান করলেন। তার স্বর ছিল অহংকারী এবং তার অভিব্যক্তি ছিল ঘৃণ্য।

তিনি যত বেশি কথা বলতে লাগলেন, ততই লোকেরা ক্ষুব্ধ হতে থাকলো। অবশেষে তারা তাকে চুপ করিয়ে দিলো। তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ আসলো। ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তাকে তাৎক্ষণিকভাবে টারপিয়ান পাথরের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফেলে দেওয়া হয়। আনন্দিত জনতা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলো। প্যাট্রিশিয়ানরা এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করলো এবং তার সাজা আজীবন নির্বাসনে পরিণত করা হলো। যখন সবাই জানতে পারলো যে রোমের মহান সামরিক বীর আর কখনও শহরে ফিরে আসবেন না, তখন তারা রাস্তায় উল্লাস প্রকাশ করা শুরু করলো। এমন উল্লাস আসলে বিদেশী শত্রুর পরাজয়ের পরেও কেউ কখনও দেখেনি।

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে, কোরিওলানাসের নামটি বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল। তার যুদ্ধক্ষেত্রের কৃতিত্ব তাকে একজন মহান সাহসী ব্যক্তি হিসেবে দেখিয়েছিল। যেহেতু নাগরিকরা তার সম্পর্কে খুব কম জানত, তাই তার নামের সাথে সব ধরণের কিংবদন্তি যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে, যে মুহূর্তে তিনি রোমান নাগরিকদের সামনে উপস্থিত হয়ে তার মনের কথা বললেন, সেই মুহূর্তেই সেই সমস্ত মহিমা এবং রহস্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি সাধারণ সৈনিকের মতো বড়াই করেছিলেন, লোকজনকে অপমান করেছিলেন। মানুষ তার সম্পর্কে যেটি কল্পনা করেছিল তিনি তা আর রইলেন না। যারা তাদের নায়ককে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, তাদের কাছে কিংবদন্তি এবং বাস্তবতার মধ্যে অসংগতি অত্যন্ত হতাশাজনক প্রমাণিত হয়েছিল। কোরিওলানাস ভেবে চিন্তে কথা না বলা তাকে দুর্বল করে দিয়ে ছিল। যে ব্যক্তি নিজের কথা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং সে সম্মানের অযোগ্য। কোরিওলানাস যদি ভেবে চিন্তে কম কথা বলতেন তাহলে তার ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না। তিনি হয়তো বা নির্বাচনে জয়লাভ করতেন, তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারতেন। কিছু মানুষই আছে যারা তার কথা ও ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। যদি এটিকে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে এটি উন্মত্তভাবে ছুটে চলে যায় যা পরবর্তীতে দুঃখের কারণ হয়। শব্দের ভান্ডার নষ্ট করে শক্তি অর্জন করা যায় না। তাই আমাদের উচিত প্রয়োজনের থেকেও কম কথা বলা।

*Oysters open completely when the moon is full; and when the crab sees one it throws a piece of stone or seaweed into it and the oyster cannot close again so that it serves the crab for meat. Such is fate of him who opens his mouth too much and thereby puts himself at the mercy of the listener.*

*---- Leonardo da Vinci*

৬

# সময়

একটা সময় টাইম-ট্রাভেল ছিল কল্পকাহিনির একটি অংশ। তবে বর্তমানে টাইম-ট্রাভেল শুধুমাত্র science fiction নয়। মূলধারার বিজ্ঞানেও গুরুত্বের সাথে টাইম-ট্রাভেল স্টাডি করা হচ্ছে। আইজ্যাক নিউটন মনে করতেন মহাবিশ্বের সকল স্থানে সময় প্রবাহের হার সমান। অর্থাৎ পৃথিবীতে ১ ঘণ্টা অতিক্রম হওয়া মানে মহাবিশ্বের সকল স্থানে ১ ঘণ্টা অতিক্রম হবে। কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করার পর সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মতে মহাবিশ্বের সকল স্থানে সময় প্রবাহের হার এক হবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে ১ ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ার মানে যে মহাবিশ্বের সকল স্থানে ১ ঘণ্টা অতিক্রম হবে বিষয়টি তা নয়। কোনো এক স্থানের এক ঘণ্টা অন্য কোনো স্থানের জন্য এক বছরও হতে পারে। নিউটনের মতে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ অতীত হয়ে গেছে, তা সকলের জন্যই অতীত। কিন্তু আইনস্টাইনের মতে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ অতীত হয়ে গেছে, তা সকলের জন্য অতীত নাও হতে পারে। সুতরাং যাকে আমরা অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মনে করছি তা আসলে বিভ্রম। অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সাথে বিরাজ করে। সময়ের আচরণ সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনের ফলে টাইম-ট্রাভেল এখন science fiction নয়। ভবিষ্যৎ-এ টাইম-ট্রাভেল সাধারণ ঘটনাতেও পরিণত হতে পারে। তখন হয়তো কাউকে এই বলে আক্ষেপ করতে হবে না যে, ইশ! যদি দশ বছর পিছনে যেতে পারতাম তবে পড়াশোনাটা ভালোভাবে করতাম ।

সাধারণভাবে টাইম-ট্রাভেল বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে সময়ের আগে বা পিছনে যাওয়া। কোনো প্রকার শারীরিক পরিবর্তন বা বায়োলজিক্যাল চেঞ্জ ছাড়াই। কিন্তু টাইম-ট্রাভেল সম্পর্কে ভাবতে গেলে শারীরিক পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যাই হোক আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মতে সময় একটি ডাইমেনশন। আমাদের পরিচিত ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এগুলো সকল স্থানেই বিরাজ করে। এবং আমরা এই ডাইমেনশনগুলোর একটি পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে যেতে পারি। যেমন, সান্তাহার থেকে ঢাকা যাওয়া। এখন টাইম যেহেতু একটি ডাইমেনশন, তাহলে টাইমেরও একটি পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে যেতে পারা উচিত। টাইমের এক পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে যাওয়া হচ্ছে অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে যাওয়া। তার মানে টাইম-ট্রাভেলকে দুই দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত অতীতে যাওয়া, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতে যাওয়া। প্রথমে ভবিষ্যতে যাবার বিষয় নিয়ে ভাবা যাক। আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই ভবিষ্যতে যাত্রা করেছি কিংবা করছি। যেমন, আপনি যখন প্লেনে চড়েন কিংবা দ্রুতগতির যানবাহনে চড়েন তখন আপনি নিজের অজান্তেই ভবিষ্যতে যাত্রা করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যাত্রার বিষয়টি খুবই সামান্য। এক সেকেন্ডের কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগ সময়। যার ফলে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না।

কোনো বস্তু যখন গতিশীল থাকে তখন ঐ বস্তুর সময় স্লো হয়ে যায়। যেমন, পৃথিবীর ৪০০ কিলোমিটার উপরে থাকা ইন্টারন্যাশনাল স্পেসস্টেশন ঘণ্টায় ২৮০০০ কিলোমিটার বেগে গতিশীল। ফলো ভূপৃষ্ঠে থাকা একজন মানুষ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেসস্টেশনে থাকা নভোচারীর মধ্যে সময়ের পার্থক্য তৈরি হয়। এখন এই ক্ষেত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতা ও বিশেষ আপেক্ষিকতা হিসেব করলে সময়ের পার্থক্য দাঁড়ায় ০.০০০০২৬৪৬ sec/day । অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের সাথে ইন্টারন্যাশনাল স্পেসস্টেশনে থাকা নভোচারীর মধ্যে একদিনে ০.০০০০২৬৪৬ sec পার্থক্য তৈরি হয়। এর অর্থ নভোচারীরা একদিনের ব্যবধানে ০.০০০০২৬৪৬ sec ভবিষ্যতে চলে যাচ্ছে। বিষয়টা কিছুটা এলোমেলো লাগছে তাইতো? বড় পরিসরে উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে করুন আপনি ২০২৪ সালে একটি রকেটে করে

আলোর বেগের ৯৯.৯৪% গতিতে স্পেস ভ্রমণে গিয়েছেন। এবং আপনার সাথে থাকা ঘড়িতে ১০ বছর অতিক্রম করার পর আপনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তাহলে আপনার হিসেব মতে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর পৃথিবীতে ২০৩৪ সাল চলবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে টাইম dilation এর কারণে পৃথিবীতে ২৯ বছর কেটে যাবে। আপনি পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবেন ২০৫৩ সাল চলছে। তার মানে আপনি ১৯ বছর ভবিষ্যতে চলে যাবেন। অর্থাৎ টাইম-ট্রাভেল। এখন এমন ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন এটি শুধুমাত্র ঘড়ির যান্ত্রিক দুর্বলতার কারণেই ঘটে থাকবে। কিন্তু না আপনার শারীরিক পরিবর্তনও এই সময় অনুযায়ীই হবে। সেটা কেমন তা বোঝার জন্য ধরে নিলাম আপনারা যমজ দুই ভাই এবং আপনাদের বয়স ২০ বিশ বছর। এখন আপনি আপনার যমজ ভাইকে পৃথিবীতে রেখে আপনি আলোর গতির ৯৯.৯৪% গতিতে স্পেসে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ১০ বছর ভ্রমণ করেন তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসেন তবে পৃথিবী আসার পর আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার বয়স হবে ৩০ বছর। সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে থাকা আপনার যমজ ভাইয়ের বয়স হবে ৩০। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর আপনি দেখবেন আপনার যমজভাই এর বয়স হয়েছে ৪৯। তার শারীরিক পরিবর্তন ৪৯ বছরের মানুষের মতোই হবে। আপনার সময় স্লো হয়ে যাওয়া মানে আপনার ব্রেইনের ফাংশনও স্লো হয়ে যাবে। আবার আপনার সময় ফাস্ট হয়ে যাওয়া মানে আপনার ব্রেইনের ফাংশনও ফাস্ট হয়ে যাবে। সে অনুযায়ী আপনার শারীরিক পরিবর্তন আসবে। তবে এমন এক্সট্রিম টাইম dilation এর ক্ষেত্রে মানুষ সারভাইভ করতে পারবে কিনা এটি একটি বড় প্রশ্ন। শুধুমাত্র বেগের কারণেই সময় স্লো হয় তা কিন্তু নয়। শক্তিশালী গ্রাভিটির জন্যও সময় স্লো হয়। আপনি যদি এমন কোনো স্থানে যান যে স্থানের গ্রাভিটি খুবই শক্তিশালী তবে সে স্থানের সময় স্লো হয়ে যাবে।

এবার অতীতে যাবার বিষয়টি ভাবা যাক। আমাদের এখন পর্যন্ত ধারণা অনুযায়ী টাইম-ট্রাভেল করে অতীতে যাবার বিষয় প্রায় অসম্ভব। অতীতে যাবার বিষয়টি নিয়ে অনেক ধরণের ফিকশনাল চিন্তাভাবনা মানুষের রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও রয়েছে। বিজ্ঞানী Kip Stephen Thorne মনে করেন ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে অতীতে যাওয়া যেতে পারে। ওয়ার্মহোল হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে দু'টি দূরবর্তী স্থানকে একত্রিত করা হয় ফলে স্থান দু'টির মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে আসে। Kip Stephen Thorne এর আইডিয়া অনুযায়ী মনে করুন মানুষ আর্টিফিশিয়াল ওয়ার্মহোল তৈরি করেছে। যার একটি মুখ থাকবে পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকা কোনো একটি ল্যাবে। অন্য মুখটি থাকবে একটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে থাকা বাহনে। ওয়ার্মহোলের মুখ দুইটি সবসময় নিজেদের মধ্যে কানেকশন বজায় রাখবে। দ্রুতগতির বাহনটি যদি আলোর বেগের কাছাকাছি গতিতে গতিশীল থাকতে পারে, তাহলে বাহনটিতে থাকা নভোচারীর ক্ষেত্রে টাইম স্লো হয়ে যাবে। ধরে নিলাম নভোচারীর ক্ষেত্রে ১০ বছর অতিক্রম হলে পৃথিবীতে ৩০ বছর অতিক্রম হবে। এখন মনেকরি ২০২৪ সালে একজন নভোচারী দ্রুতগতির এই বাহটির মাধ্যমে ১০ বছর স্পেসে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এখন নভোচারীর বাহন যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে পৃথিবীতে তখন ২০৫৪ সাল চলবে। সে অনুযায়ী বাহনে থাকা নভোচারীর ২০৩৪ সাল চলবে। তার মানে ওয়ার্মহোলের এক মুখে থাকবে ২০৩৪সাল এবং অন্য মুখে থাকবে ২০৫৪ সাল। পৃথিবীতে থাকা কোনো ব্যক্তি যদি ওয়ার্মহোলের মাধ্যমে নভোচারীর বাহনে চলে যান তবে তিনি ২০৫৪ সাল থেকে ২০৩৪ সালে চলে যেতে পারবেন। তিনি অতীত ভ্রমণ করবেন। তবে তিনি ২০৩৪ সালের পেছনে যেতে পারবেন না। এখন একটু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করি যার মাধ্যমে অতীতে যেকোনো সময়ে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে হতে পারে। আপনি যত দ্রুতগতিতে চলতে থাকবেন আপনার সময় তত স্লো হতে থাকবে। গতি বৃদ্ধি করতে করতে আলোর গতি অর্জন করতে পারলে আপনার সময় স্থির হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো স্কিপ করছি। যাই হোক আলোর গতিতে আপনার সময় স্থির। আপনি যদি আলোর চেয়ে বেশি গতিতে চলতে পারেন আপনার জন্য সময় রিভার্স হয়ে যাবে। আপনি আলোর চেয়ে যত বেশি গতিতে চলতে থাকবেন আপনার সময় তত বেশি রিভার্স হারে চলতে থাকবে। এখন আপনার সময় যদি রিভার্স হয়ে যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই আপনি অতীতে যেতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে দুইটি প্রধান সমস্যা রয়েছে। প্রথমত আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আলোর চেয়ে বেশি গতি সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত আপনার সময় যদি রিভার্স হয়ে যায়, আপনি অক্সিজেন গ্রহণের পরিবর্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করবেন। এমন ক্ষেত্রে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। এখন পর্যন্ত অতীতে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। এখন আমরা যদি মনে নিই মানুষ কোনো প্রকার শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াই অতীতে যেতে

সক্ষম হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু প্যারাডক্স তৈরি হবে। যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে 'গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স'। বিষয়টি কেমন তা বোঝার জন্য মনে করুন, আপনি একটি টাইম মেশিন বানিয়ে অতীতে গিয়ে আপনার বাবাকে জন্ম দেবার আগেই আপনি আপনার দাদাকে হত্যা করে ফেলেছেন। তাহলে এখানে খেয়াল করুন আপনি যদি আপনার দাদাকে হত্যা করেন তবে আপনার বাবার জন্ম হবে না, যার ফলে আপনারও জন্ম হবে না। আর আপনার জন্ম না হলে আপনি টাইম মেশিন বানিয়ে অতীতেও যেতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনি আপনার দাদাকে হত্যাও করতে পারবেন না। তার মানে এখানে একটি চক্রাকার সমস্যা তৈরি হয়েছে। এটিই হচ্ছে প্যারাডক্স। তবে প্রকৃতি প্যারাডক্স সমর্থন করে না। সুতরাং অতীতে যাওয়া সম্ভব হলেও গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স তৈরি হবে না। এই গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্সের সমাধান কী? অনেকের মতে যদি অতীতে যাওয়া সম্ভব হয় তবে আপনি অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। আপনি আপনার দাদাকে হত্যা করতে চেয়েও বারবার ব্যর্থ হবেন। কোনোভাবেই আপনার দাদাকে হত্যা করতে পারবেন না। ফলে কোনো প্রকার প্যারাডক্স তৈরি হবে না। এই যুক্তির ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত দ্বিমত রয়েছে। অতীতে যাওয়া গেলেও আমি অতীত পরিবর্তন করতে পারবো না এটি মানতে পারছি না। কারণ আপনি অতীতে জীবনযাপন করতে চাইলে আপনাকে কিছু না কিছু পরিবর্তন করতে হবেই । বাটারফ্লাই ইফেক্ট এর মতো সামান্য পরিবর্তনও অনেক বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কোনো মানুষ যদি অতীতে গিয়ে থাকেন তবে কী উদ্দেশ্যে গিয়েছেন সেটি তার ব্রেইন থেকে মুছে যাবে। আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। আমরা জানি সাব এটমিক পার্টিকেলের আচরণ আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে সম্পূর্ণ অদ্ভুত। সাব এটমিক পার্টিকেলের উপর ভিত্তি করে অনেকে মনে করেন মানুষ যদি অতীতে যেতেও পারে তবে সে যাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্যারালাল ইউনিভার্সে । যার ফলে আমাদের ইউনিভার্সে কোনো প্রকার প্যারাডক্স তৈরি হবে না। অনেকে মনে করেন টাইম –ট্রাভেল এন্ট্রপির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এন্ট্রপি যেমন একমুখী টাইমও একমুখী যা শুধুমাত্র সামনের দিকে এগিয়ে চলে । যার কারণে অতীতে যাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু অতীতে যাওয়া সম্ভব নয় সেহেতু আপনার ও আপনার পরিবারের সাথে কাটিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো অনেক মূল্যবান। প্রত্যেকটি মুহূর্তকে একমাত্র স্মৃতিতেই ধরে রাখা সম্ভব ।  তাই আমাদের উচিত হবে অযথা সময় নষ্ট না করে মূল্যবান কাজে ব্যয় করা ।

*Time is not what you think it is;  time is an illusion*

*--- Albert Einstein*

৭

# নতুন পথ চলা

মুনিবা মাজারি একজন পাকিস্তানি মানবাধিকার কর্মী, চিত্রশিল্পী, টেলিভিশন উপস্থাপক, মোটিভেশনাল স্পিকার ও গায়িকা। তিনি দ্য আইরন লেডি অব পাকিস্তান নামেও পরিচিত। তিনি ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ পাকিস্তানের পাঞ্জাবের রাহিম ইয়ার খান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বড় হন। তার পরিবার রক্ষণশীল পরিবারগুলোর মধ্যে একটি। মুনিবার সবসময়ই শিল্পের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। যখন তার বয়স আঠারো, তখন তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। আসলে তার মত না থাকলেও 'না' কথাটি বলার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ মেয়েদের পরিবারে না বলার অধিকার ছিল না।

তার দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। তার জীবনের মোড় পরিবর্তন হয় ২০০৮ সালে তার বিয়ের ঠিক দুই বছর পর। ২০০৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী, তিনি এবং তার স্বামী কুয়েটা শহর হতে রাহিম ইয়ার খান শহরে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি তার স্বামী ড্রাইভ করছিলেন। হঠাৎ তার স্বামী ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোনভাবে তার স্বামী গাড়ি হতে বের হতে পারেন। কিন্তু মুনিবা গাড়ির ভিতরেই রয়ে যান। মুনিবা অনেক আঘাতপ্রাপ্ত হন। তার ডান হাত, কবজি, কাধে ফ্র্যাকচার হয়। রিব কেজ আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফুসফুস ও লিভার ভয়ানক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর তার চিকিৎসা চলতে থাকে। তার শ্বাস নেওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। ইউরিন ও অন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ তিনি হারিয়ে ফেলেন।

মেরুদন্ডে গুরুতর আঘাত পাওয়ার জন্য তিনি সারা জীবনের জন্য প্যারালাইজড হয়ে যান। যে জায়গাটিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে সেখানে আশেপাশে কোন হাসপাতাল এবং কোন কিছু ছিল না। অনেক মানুষজন দৌড়ে আসেন তাকে বাঁচাতে। কেউ বলেন, আমরা কী তাকে এখানেই রেখে দিব? সে তো মরতে চলেছে। তারপর তারা টেনে তাকে গাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করে থাকে। এতে তার মেরুদন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সেই জায়গা থেকে তিন ঘন্টার দূরত্বে একটি জিপ গাড়ি ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো তাকে জিপ গাড়িতে করে হাসপাতালে নেওয়ার। তার প্রায় অর্ধেক শরীর ফ্র্যাকচারড এবং অর্ধেক শরীর প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাকে বেশ কয়েকটি অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তার হাতে অনেকগুলো টাইটেনিয়াম প্লেট বসানো হয়। তার মেরুদন্ড সোজা করার জন্য সেখানেও টাইটেনিয়াম প্লেট বসানো হয়। বেশি প্লেট বসানোর কারণে পাকিস্তানের মানুষজন তাকে দ্য আইরন লেডি অব পাকিস্তান বলে থাকে। তিনি প্রায় আড়াই মাস হাসপাতালে অবস্থান করেছিলেন। তার হাসপাতালে কাটানো দিনগুলো অনেক ভয়ানক ছিল। একদিন ডাক্তার তার কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি আপনি একজন শিল্পী হতে চান কিন্তু আপনি হয়েছেন গৃহিণী। আপনার জন্য কিছু খারাপ খবর আছে। আপনি কোনদিন আর আঁকতে পারবেন না। কারণ আপনার হাতের কবজি এবং হাতের আকৃতি আগের মতো নেই। আপনি কখনও কলম ধরতে পারবেন না।

পরের দিন ডাক্তার আবার আসলেন এবং বললেন, আপনার মেরুদন্ডের আঘাত খুবই গুরুতর। আপনি কখনও আর হাঁটতে পারবেন না।

পরের দিন আবার ডাক্তার আসলেন এবং বললেন, যেহেতু আপনার অবস্থা অনেক খারাপ তাই আপনি কখনও মা হতে পারবেন না। আপনি আর কোন শিশু জন্ম দিতে পারবেন না।
এটি শুনে তিনি যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন।

তিনি তার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি ? আমার সাথেই কেন? নিজেকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন, আমি বেঁচেই বা আছি কেন? বেঁচে থাকার অর্থই বা কী? তিনি ভাবলেন, আমি লিখতে পারবো না, আমি হাঁটতে পারবো না ঠিক আছে। কিন্তু আমি মা হতে পারবো না।
আসলে সন্তান - সন্ততি ছাড়া মেয়েরা পরিপূর্ণতা পায় না, এ চিন্তাধারা সমাজে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। তাই তার মনে হচ্ছিল, আমি এখন সারা জীবনের জন্য অপূর্ণ থাকতে চলেছি। আমার জীবনের মানে কী ?

তার আত্মীয়-স্বজন ভীত ছিল এটি ভেবে যে, তার এখন ডিভোর্স হয়ে যাবে। তিনি এক টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে টানেলের শেষ প্রান্তে কোন আলো ছিল না। তার মা তাকে বললেন, শীঘ্রই এ সময় অতিবাহিত হবে। খোদা তোমার জন্য অনেক ভালো কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আমি জানি না সে পরিকল্পনা কী, কিন্তু তোমার জন্য ভালো কিছু আছে সেটি জানি।

মুনিবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শব্দের আত্মাকে সুস্থ করার শক্তি রয়েছে। তার মায়ের কথাতে তিনি যেন আস্থা ফিরে পান। তার ভাই ও মায়ের কথা মনে করে তিনি হাল ছাড়েন না। তিনি তার ভাইকে বলেন, আমি হাসপাতালের এই সাদা দেওয়াল দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছি, আমাকে কিছু রঙ দাও, আমি আবার আঁকতে চাই।

তিনি হাসপাতালে প্রতিটি দিন কেঁদে অতিবাহিত করছিলেন কিন্তু কারও প্রতি কোন অভিযোগ করেন নি।

তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তিনি বাড়িতে ফিরে আসলেন। তিনি পরবর্তীতে উপলব্ধি করলেন যে, তিনি বসতে পারছেন না। তার সারা শরীরে অ্যালার্জি এবং ক্ষত ছিল। তাই ডাক্তার তাকে দুই বছর শুয়ে থাকার নির্দেশনা দেন। তিনি দুই বছর একই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি সেই ঘরের জানালার দিকে তাকাতেন, পাখির কিচিরমিচির শুনতেন এবং ভাবতেন যে, একদিন সময় আসবে তিনি বাইরে বের হবেন।

তিনি উপলব্ধি করলেন যে, যেদিন তিনি বসতে পারবেন এবং বাইরে যেতে সক্ষম হবেন, সেদিন তিনি মানুষের সাথে তার কষ্ট ভাগাভাগি করবেন। বলবেন যে, তারা কতোটা ভাগ্যবান। কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে না।

দুই বছর আড়াই মাস পর তিনি হুইল চেয়ারে বসতে সক্ষম হন। সেদিন তার পুনরায় জন্ম হয়। তিনি আয়নার সামনে যান এবং নিজেকে বলেন, আমি জানি কোন অলৌকিক ক্ষমতার বলে আমি হাঁটতে পারব না। আমি ঘরের কোণে বসে থেকে কাঁদতে পারি না , কারণ কেউ আমাকে সব সময় সাহায্য করতে আসবে না। সুতরাং আমাকে আমি যে রকম সে রকম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি তত ভালো। তারপর তিনি দুর্ঘটনার পর প্রথমবার নিজে লিপস্টিক তার ঠোঁটে লাগালেন।

তারপর তিনি তা মুছে ফেললেন, এবং কাঁদলেন। বললেন, হুইলচেয়ারে বসা ব্যক্তির এগুলো করা উচিত নয়। লোকে কী বলবে। তিনি আবার তার ঠোঁট রাঙালেন কিন্তু এইবার তিনি নিজেকে ভিতর থেকে পারফেক্ট মনে করলেন।

সেদিন থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তার জন্য বাঁচবেন। তার অন্য কারও জন্য পারফেক্ট হবার দরকার নেই। তিনি নিজেই নিজের জন্য পারফেক্ট।

আমাদের সকলের মধ্যেই ভয় আছে। কারও জানা জিনিসে ভয়, কারও অজানা জিনিসে ভয়, লোকজন হারানোর ভয়, সম্পদ হারানোর ভয়, স্বাস্থ্য হারানোর ভয় ইত্যাদি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আর ভয় পাবেন না। তিনি তার সকল ভয় কাগজে লিখলেন এবং ছিঁড়ে ফেললেন। তার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল ডিভোর্স। তার স্বামী তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছিলেন। যার জন্য শুরুতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মানসিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

যেদিন তিনি শুনতে পান যে, তার স্বামী আরেকটি বিবাহ করছেন, তিনি তাকে টেক্সট পাঠান এবং বলেন, আমি তোমার জন্য অনেক আনন্দিত। সর্বদা সুখী থেকো।

তার দ্বিতীয় বড় ভয় ছিল যে, তিনি আর মা হতে পারবেন না। যেটির জন্য তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, পৃথিবীতে অনেক শিশু রয়েছে যাদের কোন মা-বাবা নেই। তাই কাঁদার কোন মানেই হয় না। তাই তিনি একটি শিশু দত্তক নেন।

তার তৃতীয় বড় ভয় ছিল, যে তিনি লোকজনের সামনে যেতে ভয় পেতেন। তিনি নিজেকে লোকজনের সামনে থেকে লুকিয়ে রাখতেন। পরবর্তীতে তিনি সেই ভয়ও কাটিয়ে উঠেন। তার মধ্যে এই ভয় কাজ করতো যে, মানুষ কী তাকে এভাবে হুইলচেয়ারে বসা অবস্থায় গ্রহণ করবে? তিনি নিজেকে ডিসএবল ভাবতেন সব সময়। তারপর তিনি ভাবলেন তিনি শারীরিক দিক থেকে পারফেক্ট না হলেও মানসিক দিক থেকে পারফেক্ট হতেই পারেন। তাই তিনি নিজেকে লোকজনদের মধ্যে রাখা শুরু করলেন।

তিনি আঁকা শুরু করলেন, বিভিন্ন সেমিনারে যেতে শুরু করলেন, মানুষদের মাঝে তার গল্প শেয়ার করা শুরু করলেন , টেলিভিশন সো করা শুরু করলেন। দ্য আইরন লেডি অব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি পেলেন। শুরু হলো তার নতুন পথ চলা।

আপনি যেমন তেমন হিসেবে যদি নিজেকে গ্রহণ করেন, পৃথিবী আপনাকে গ্রহণ করবে। আপনার মনে অনেক পরিকল্পনা, ইচ্ছা, স্বপ্ন রয়েছে। কিছু হয়তো বা পূরণ হয়েছে, কিছু হয় নি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সফলতা শুধু আপনার একার না। আপনার সফলতার পেছনে আরও মানুষ রয়েছে, তাদের কখনও হারিয়ে যেতে দিবেন না। তাদের আগলে রাখুন।

*There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so powerful that they can change your DNA. These events are so intense that they can break you physically. They may deform your body, but they also transform your soul. While these incidents may break and deform you, they ultimately mold you into the best version of yourself.*

*----- Muniba Mazari*

৮

# রাজার পুত্র রাজা

মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একলব্য । একলব্য ছিল নিষাদ রাজ্যের রাজপুত্র। অনার্য হিসেবে নিষাদরা সবসময়ই ছিল অবহেলিত । তাদের অবয়ব, বেটে আকৃতি, কুচকুচে কালো গাত্রবর্ণ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে পারদর্শী না হওয়া তাদেরকে আর্যদের চোখে করে তুলেছিল হীন । এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই একলব্য স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হওয়ার । সে পণ করেছিল যে কোন মূল্যে সে গুরু দ্রোণ এর শিষ্য হবে ।
দ্রোণাচার্য ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিশারদ ও ধনুর্ধর । তিনি ছিলেন পান্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষার গুরু এবং যুদ্ধ শিক্ষার সমস্ত জ্ঞান তিনি তাদের প্রদান করেছিলেন। সেসময় ভারতবর্ষে দ্রোণাচার্যের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্রগুরু ছিল না । অর্জুন ছিল দ্রোণাচার্যের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য । অর্জুনকে তিনি যে বিদ্যা দিয়েছেন অন্য কাউকে তিনি তা দেননি । পুত্র সমুতুল্য স্নেহ করতেন তিনি অর্জুনকে । তাই কেউ ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ হোক তা তিনি চাননি । অর্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্যের এই বাৎসল্য একসময় একলব্যের জীবনে নিয়ে এসেছিল বিপর্যয় ।

একলব্য যখন তার পিতাকে জানালো সে গুরু দ্রোণাচার্যের শিষ্য হতে চায় এবং সে উদ্দ্যেশ্যে ঘর থেকে বের হবে, তখন বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন পিতা হিরণ্যধনু। পিতা হিরণ্যধনু বুঝতে পেরেছিলেন আর্য নৃপতি লালিত ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য কখনোই একজন শূদ্র নিষাদপুত্রকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু একলব্য তার কথায় ছিল অনড়। এগিয়ে এলেন পিতামহ অনোমদর্শী। তিনি বললেন দ্রোণাচার্য উদার মানুষ, তার হৃদয় আকাশের মত বিশাল, একলব্যকে সে বুকে টেনেও নিতে পারে। আর একলব্য যদি আর্যদের তীর নিক্ষেপ জ্ঞান দখলে আনতে পারে তাহলে আর্যদের হারানো সহজ হবে। একলব্য এই বিদ্যা নিষাদদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, একটা সময়ে ব্যাধ সমাজে অসংখ্য ধনুর্বিদ তৈরি হবে, অস্ত্রবিদ্যায় আর্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে নিষাদরা। এরপর আর রাজা হিরণ্যধনু পুত্রের কথায় আর আপত্তি করলেন না। হিরণ্যধনু ভাবলেন ছেলে যদি দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যার্জন সম্পন্ন করে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে পারে তাহলে নিষাদকুলে মস্ত বড় একটা ঘটনা হয়ে যাবে। এর আগে কোন নিষাদ আর্যগুরুর কাছে বিদ্যার্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে নি, একলব্যই প্রথম সে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। হিরণ্যধনু এও ভেবে হতাশ ছিলেন যদি দ্রোণাচার্য একলব্যকে ঘৃনায় ফিরিয়ে দেন তাহলে একলব্যের হৃদয় ভেঙে যাবে। এরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এর মধ্যেই তিনি পুত্রের যাত্রার আয়োজন করলেন।

এবড়ো-থেবড়ো, জঙ্গলাকীর্ণ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একাই হস্তিনাপুরের রাজপথে যাত্রা শুরু করল একলব্য। কোন সৈন্য সামন্ত দরকার নেই তার। সৈন্যদলের আড়ম্বর তার কাছে অর্থহীন। সে যে দ্রোণাচার্যের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে, যেন সে তীর্থ দর্শনে যাচ্ছে। তার মনে একটাই আকুতি কখন সে দ্রোণাচার্যের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করবে, কবে আচার্যের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করবে। তার জীবনের মহার্ঘ হল আচার্য দ্রোণের শিষ্যত্ব লাভ।

দীর্ঘদিনের যাত্রায় ক্লান্ত শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত একলব্য যখন গুরু দ্রোণের আশ্রমে পৌছালো তখন গুরু দ্রোণ কৌরব ও পান্ডবদের শিক্ষাদানে ব্যস্ত। একলব্য গুরুকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল সে গুরু দ্রোণের শিষ্য হতে চায়, তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন সে দ্রোণাচার্যের শিষ্য হয়ে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হবে। বিস্মিত হয়ে তাকালেন দ্রোণাচার্য, তার চোখেমুখে তাচ্ছিল্য আর উপস্থিত শিষ্য দের মধ্যে তৈরি হল একলব্যের প্রতি উপহাস। দ্রোণাচার্যের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ টগবগিয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন একলব্য একেবারেই পৃথক এক জনগোষ্ঠীর মানুষ, তার আচার ব্যবহার অবয়ব সবই আর্যদের থেকে আলাদা, তাকে কৌরব পান্ডবদের সাথে বসিয়ে শিক্ষাদান করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ক্ষুব্ধ গলায় তিনি একলব্যকে জানিয়ে দিলেন নিচু জাতের হীন বংশের কাওকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারবেন না। বহু বাসনার চির আকাঙ্খিত গুরু দ্রোণাচার্যের মুখে এ কথা শুনে নিষাদপুত্র একলব্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রাপ্তির আকাঙ্খায় যে অরন্য ভেদ করে একলব্য এসেছিল, অপ্রাপ্তির বুক ভরা কষ্ট নিয়েই সে অরণ্যের দিকে পা বাড়াল একলব্য।
গহীন অরণ্যে শুরু হল একলব্যের একনিষ্ঠ সাধনা, গুরু দ্রোণের মূর্তি তৈরি করে মনে মনে তাকেই গুরু মেনে নিজেই

নিজেকে দীক্ষিত করে তুলতে লাগল একলব্য। নিজে নিজে সে এমন সব বাণ আবিষ্কার করল যা সে ছাড়া আর কেও জানে না। দ্রোণাচার্যের প্রতি নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার গুণেই সে এসব অস্ত্রের সন্ধান করতে শিখে গেল।

একদিন বনে ঘুরতে এসে গুরু দ্রোণ আর অর্জুন মুখোমুখি হল একলব্যের, একলব্য তখন দ্রোণের সব শিষ্য দের থেকেও বড় যোদ্ধা। একলব্যের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে দ্রোনাচার্য জানতে চান কে তার গুরু। একলব্য দ্রোণাচার্য কে গুরু বলে পরিচয় দেয়। সে দ্রোণাচার্যকে তার মুর্তি দেখিয়ে বলল গুরুদেব আমি এই মুর্তির ভিতর আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছি আর আপনাকেই গুরু মেনে সাধনা করেছি। আজকে আমার যে অর্জন তা সব আপনার জন্যই, আপনিই আমার গুরু। তখন সংশয়ে ভরে উঠে অর্জুনের মন, কারণ অর্জুন এর থেকে বেশি পারদর্শি ধনুর্ধর যে আর কেউ নেই, আর সেই যে গুরু দ্রোণ এর একমাত্র শিষ্য যাকে গুরু দ্রোণ সব বিদ্যাই দিয়েছেন। তাহলে একলব্য এত বিদ্যা কিভাবে শিখল, তবে কি গুরুদেব গোপনে একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্জুনের মনের সংশয় দুর করতে দ্রোণাচার্য কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। যে কিনা কখনো একলব্যকে হাতে কলমে শিক্ষা দেননি, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দুর দুর তাড়িয়ে দিয়েছেন, গুরু না হয়েও দ্রোণাচার্য একলব্যের কাছে গুরদক্ষিনা চেয়ে বসলেন।

এতদিন যে শিক্ষক কে দেবতুল্য সম্মান দিয়েছেন, আজ তার শিষ্যত্ব পাবে ভেবে একলব্য সরল মনে দ্রোণের যে কোন চাওয়া পূরণের প্রতিজ্ঞা করে বসে। দ্রোণ এটাই আশা করেছিলেন, তিনি গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল চেয়ে বসলেন। অথচ উনি ভালমতোই জানতেন তীর চালানোর জন্য সবচেয়ে বেসি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে বৃদ্ধাআঙ্গুল, একজন তীরন্দাজের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেওয়ার অর্থ আক্ষরিক ভাবে তাকে হত্যা করার সমতূল্য। প্রতিজ্ঞ্যাবদ্ধ একলব্য গুরু দ্রোণের ধুর্তামি শেষ মুহুর্তে বুঝতে পারলেও তার কথা রাখেন। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজহাতে কেটে সে তা গুরুদক্ষিণা হিসেবে দান করে। কিন্তু গুরু দ্রোণ এর মধ্যে একলব্যের প্রতি কোন মায়া, ভালবাসার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। দ্রোণাচার্য এবার মনের শান্তিতে শিষ্যদের নিয়ে ফিরে গেলেন।

এত কিছুর পরেও একলব্য থেমে যায়নি, বার বার বাঁধা পাওয়ায় একলব্যের জেদ চেপে বসে। চার আঙ্গুলি দিয়েই আবার কঠোর সাধনা শুরু করে একলব্য। দিনের পর দিন কঠিন চর্চা করে সে নিজেকে আবার ও ছাড়িয়ে যায়। নিজের সাধনা পরিপুর্ণ হলে সে রাজ্যে ফিরে আসে।

যুগে যুগে ঠিক এমনটিই ঘটে চলেছে । আসলে এ যুগেও উচ্চ শিক্ষা কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার বা বিদ্যার তো সবার অধিকার রয়েছে । পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোক বসবাস করে । বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মেধার অধিকারী । কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে তাদের মেধা সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না বা পাওয়ার সুযোগ হয় না। পেলেও তাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণি উপকৃত হয় । যেমন রাজার ছেলে রাজা হয়, তেমনই প্রথা এখনও চালু আছে তবে ভিন্ন আঙ্গিকে।

*Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.*

*----- Kofi Annan*

৯

# অদূরদর্শিতা

আপনি বর্তমানে যা কিছু দেখতে ও শুনতে পান যেমন, সর্বশেষ খবর, চারপাশে মানুষের মতামত ও কাজ, যা কিছু সবচেয়ে নাটকীয় মনে হয়, সেসব দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন। এটি আমাদের প্রাণী বৈশিষ্ট্যের অংশ। এই বৈশিষ্ট্য আপনাকে দ্রুত ফলাফলের এবং সহজে অর্থপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয় । এই কারণেই আপনি দ্রুত ফলাফল এবং সহজে অর্থ উপার্জনের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন লোভনীয় পরিকল্পনার ফাঁদে পড়েন। বর্তমান পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্যও এটি আপনাকে বাধ্য করে। যখন কোন ঘটনা এক বা অন্যদিকে মোড় নেয়, তখন অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত বা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা বা প্রশস্ততা দিয়ে তাদের পরিমাপ করতে শিখুন; যারা তাদের কর্মের পরিণতি দেখতে পান না, যারা ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকেন, তাদের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না। তারা আপনাকে এই শক্তি দিয়ে সংক্রমিত করবে। আপনার দৃষ্টি অবশ্যই বড় ঘটনাবলির দিকে থাকা উচিত যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়।

আপনার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো কখনও ভুলে যাবেন না। আপনার উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি, ধৈর্য এবং স্পষ্টতা থাকতে হবে যেগুলো আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।

১৭১৯ সালের গ্রীষ্ম এবং শরতের শুরুর দিকে, সাউথ সী কোম্পানির অন্যতম প্রধান পরিচালক, ইংরেজ জন ব্লান্ট, প্যারিসের সর্বশেষ খবরগুলি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে পড়ছিলেন। ফরাসিরা এক অসাধারণ অর্থনৈতিক উত্থানের মাঝখানে ছিল। ফরাসিরা মিসিসিপি কোম্পানির সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যে কোম্পানিটি স্কটসম্যান জন লো ফরাসিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লুইজিয়ানা অঞ্চলের সম্পদ শোষণ করার জন্য চালু করেছিলেন। জন কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দিলেন। এর দাম বাড়তে থাকল। সকল শ্রেণির ফরাসিরা অর্থ উত্তোলন করছিল এবং অসাধারণভাবে ধনী হয়ে উঠছিল। নতুন ধনীদের বোঝাতে 'মিলিয়নিয়ার' শব্দের উদ্ভব ঘটেছিল।

এই ধরণের খবর ব্লান্টকে রাগান্বিত এবং ঈর্ষান্বিত করেছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ইংরেজ।

মিসিসিপি কোম্পানির সাফল্যের সাথে সাথে, প্যারিস সমগ্র ইউরোপ থেকে বিনিয়োগের মূলধন পেতে থাকে। যদি এটি অব্যাহত থাকে, তাহলে ফ্রান্স শীঘ্রই আমস্টারডাম এবং লন্ডনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের ফিন্যান্স ক্যাপিটালে পরিণত হবে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যদি আবার যুদ্ধ হয়, তাহলে ফরাসিদের এই নতুন শক্তি তাদের প্রধান শত্রু ইংল্যান্ডের জন্য শুধুই বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
ব্যক্তিগতভাবে ব্লান্ট ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ জুতা তৈরির কারিগরের ছেলে। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ইংরেজ সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণের লক্ষ্য রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সেখানে পৌঁছানোর উপায় হবে ইউরোপে আর্থিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। যা লো এর এবং সাউথ সী কোম্পানির জয়েন্ট-স্টক কর্পোরেশনের জনপ্রিয়তার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল।

স্টক কেনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল এবং লাভ করমুক্ত ছিল। যেখানে ঐতিহ্যবাহী উপায়ে জমি কিনে সম্পদ তৈরি করা ছিল ব্যয়বহুল এবং তা ছিল অত্যন্ত করযোগ্য। লন্ডনে এই ধরণের বিনিয়োগ সর্বোগ্র জনপ্রিয় ছিল। ব্লান্টের পরিকল্পনা ছিল সাউথ সী কোম্পানিকে ইউরোপের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে পরিণত করার, কিন্তু জন লো একটি সাহসী উদ্যোগের মাধ্যমে এবং ফরাসি সরকারের পূর্ণ সমর্থনের মাধ্যমে তার সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ব্লান্টকে তার নিজের জন্য এবং ইংল্যান্ডের ভবিষ্যতের জন্য আরও বড় এবং আরও ভালো কিছু করতে হতো। সাউথ সি কোম্পানি ১৭১০ সালে গঠিত হয়েছিল একটি উদ্যোগ হিসেবে যা ইংরেজ সরকারের বিশাল ঋণের একটি অংশ পরিচালনা করবে, যার বিনিময়ে কোম্পানিটিকে দক্ষিণ আমেরিকার সাথে ইংল্যান্ডের সমস্ত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হবে।

বছরের পর বছর কোম্পানিটি কোন ব্যবসা করেনি, বরং সরকারের জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছে। কোম্পানির নেতৃত্বের মাধ্যমে, ব্লান্ট সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, বিশেষ করে রাজা প্রথম জর্জের সাথে, যিনি এর অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হয়ে ওঠেন এবং কোম্পানির গভর্নর মনোনীত হন। ব্লান্টের জীবনের মূলমন্ত্র সবসময়ই ছিল 'বড় চিন্তা করো', এবং এটি তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। এবং তাই, ফরাসিদের ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজতে গিয়ে, অবশেষে ১৭১৯ সালের অক্টোবরে তিনি এমন একটি পরিকল্পনা হাতে পান যা তার নীতিবাক্যের যোগ্য ছিল এবং তিনি নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন যে ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবে।

ফ্রান্স ও স্পেনের সাথে যুদ্ধের সময়, ত্রিশ বছর ধরে যে বিশাল ঋণ হয়েছিল সেটিই ছিল ইংরেজ সরকারের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যা কিছু অর্থায়ন করা হয়েছিল সব ঋণের মাধ্যমে। ব্লান্টের প্রস্তাবটি ছিল সহজ এবং বেশ আশ্চর্যজনক।

সাউথ সী কোম্পানি সরকারকে একটি ভালো ফি প্রদান করবে যাতে ঋণটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়, যার মূল্য ৩১ মিলিয়ন ইউরো। এরপর কোম্পানিটি এই ৩১ মিলিয়ন ইউরো ঋণটি বেসরকারীকরণ করবে এবং এটিকে একটি পণ্যের মতো বিক্রিকরবে, সাউথ সী কোম্পানির শেয়ার হিসাবে – এক শেয়ারের সমান ঋণ ১০০ ইউরো। যারা সরকারকে টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা তাদের আইওইউ সাউথ সী কোম্পানির সমতুল্য শেয়ারে রূপান্তর করতে পারবেন। তাদের অবশিষ্ট শেয়ার জনসাধারণের কাছে বিক্রিকরা হবে। একটি শেয়ারের দাম ১০০ ইউরো থেকে শুরু হবে। যেকোনো স্টকের মতো, দাম বাড়তে–কমতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে দাম কেবল বাড়বে।

সাউথ সী কোম্পানির একটি আকর্ষণীয় নাম ছিল এবং তারা দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল সম্পদের ব্যবসা শুরু করার সম্ভাবনাও প্রকাশ করেছিল। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা ইংরেজ ঋণদাতাদের দেশপ্রেমিক হিসেবে কর্তব্যও ছিল, কারণ তারা ঋণ বাতিল করতে সাহায্য করবে যেখানে সরকার তাদের বার্ষিক সুদের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে। যদি শেয়ারের দাম বাড়ে, যেমনটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই হবে, ক্রেতারা লাভের জন্য নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবে এবং কোম্পানিটি ভালো লভ্যাংশ দিতে পারবে। জাদুর মতোই ঋণ সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারবে। এটিই হবে সরকারের সকল সমস্যার সমাধান, এবং এটি ব্লান্টের স্থায়ী খ্যাতি নিশ্চিত করবে।

১৭১৯ সালের নভেম্বরে যখন রাজা জর্জ প্রথম ব্লান্টের প্রস্তাবের কথা শুনতে পান, তখন তিনি বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেননি যে এত নেতিবাচক (ঋণ) কীভাবে তাৎক্ষণিকভাবে ইতিবাচকে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া, অর্থের এই নতুন পরিভাষাটি সরাসরি তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ব্লান্ট এত দৃঢ়তার সাথে কথা বলেন যে তিনি নিজেকে তার উৎসাহে ডুবে যেতে দেখেন। সর্বোপরি, তিনি জর্জের দুটি বৃহত্তম সমস্যা এক ধাক্কায় সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, এবং এই ধরণের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা কঠিন ছিল।

রাজা জর্জ ছিলেন ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয়, সর্বকালের সবচেয়ে অজনপ্রিয় ইংরেজ রাজাদের একজন।এটা সম্পূর্ণরূপে তার দোষ ছিল না। তিনি জন্মগতভাবে ইংরেজ ছিলেন না, বরং জার্মান ছিলেন। তার পূর্বে উপাধি ছিল ব্রান্সউইকের ডিউক এবং হ্যানোভারের ইলেক্টর। ১৭১৪ সালে ইংল্যান্ডের রানী অ্যান মারা গেলে, জর্জ ছিলেন তার নিকটতম জীবিত প্রোটেস্ট্যান্ট আত্মীয়। কিন্তু তিনি সিংহাসনে আরোহণের মুহূর্তে তাঁর নতুন প্রজারা তাকে তাদের পছন্দের মনে করেনি।
তিনি ভয়ঙ্কর উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলতেন, আর তার আচরণ ছিল রুক্ষ, আর তিনি সবসময় আরও টাকার জন্য লোভী থাকতেন। বয়স বাড়লেও তিনি ক্রমাগত তার স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীদের পিছনে ছুটতেন, যাদের কেউই বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল না। তার রাজত্বের প্রথম বছরগুলিতে বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল।
যদি তারা এ কাজে সফল হয়, তাহলে জনগণ তাদের এ কাজে স্বাগত জানাবে এটি তার চিন্তাভাবনা ছিল।

জর্জ তার নতুন প্রজাদের কাছে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়েছিলেন যে তিনি নিজের মতো করে একজন মহান রাজা হতে পারেন। সিংহাসনে আরোহণের আগে থেকে , সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া চরম ঋণ তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। যেকোনো ধরণের ঋণের প্রতি জর্জের প্রায় অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ছিল, যেন তার নিজের রক্তই জোঁকের মতো ঝরে পড়ছে। ব্লান্ট তাকে ঋণ বাতিল করে ইংল্যান্ডে সমৃদ্ধি আনার সুযোগ দিচ্ছিলেন, রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সুযোগ দিয়েছিলেন। রাজা প্রস্তাবটির পেছনে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলেন ।

তিনি ১৭২০ সালের জানুয়ারিতে সংসদে প্রস্তাবটি উপস্থাপনের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারের চ্যান্সেলর জন আইসলেবলকে অর্পণ করেছিলেন। সংসদকে এটি একটি বিল আকারে অনুমোদন করতে হতো । প্রায় সাথে সাথেই ব্লান্টের প্রস্তাবটি বেশ কয়েকজন এমপির মধ্যে তীব্র বিরোধিতা জাগিয়ে তোলে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে হাস্যকর বলে মনে করেন। কিন্তু আইসলেবলের বক্তৃতার কয়েক সপ্তাহ পরে, বিলের বিরোধীরা হতাশ হয়ে যায় কারণ তাদের পক্ষে সমর্থন ধীরে ধীরে কমে যায়। এই উদ্যোগের অগ্রিম শেয়ার কার্যত ধনী এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ইংরেজদের উপহার দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে সংসদের বিশিষ্ট সদস্যরাও ছিলেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত লাভের আশায় বিলটি অনুমোদন করেছিলেন। সেই বছরের এপ্রিলে বিলটি পাস হলে, রাজা জর্জ নিজেই সাউথ সী হাউসে উপস্থিত হন এবং নতুন উদ্যোগে শেয়ারের জন্য ১০০,০০০ ইউরো জমা দেন। তিনি এতে তার আস্থা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ বিলটি পাসের জন্য জনসাধারণকে আকর্ষণ করেছিল এবং সাউথ সী কোম্পানির শেয়ারের প্রতি আগ্রহ ইতিমধ্যেই তুঙ্গে পৌঁছেছিল। কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল লন্ডনের একটি এলাকা যা এক্সচেঞ্জ অ্যালি নামে পরিচিত, যেখানে প্রায় সমস্ত স্টক বিক্রিহয়ে গিয়েছিল।

গলির চারপাশের সরু রাস্তাগুলি দিন দিন যানজটে জমে উঠছিল। প্রথমে বেশিরভাগ ধনী এবং প্রভাবশালীরাই তাদের শেয়ার কিনতে আসত। ক্রেতাদের মধ্যে শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন – জন গে, আলেকজান্ডার পোপ এবং জোনাথন সুইফট । শীঘ্রই স্যার আইজ্যাক নিউটন আগ্রহ অনুভব করেন এবং তার সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ ৭,০০০ ইউরো বিনিয়োগ করেন। তবে কয়েক সপ্তাহ পরে, তিনি সন্দেহ বোধ করেন। দাম বাড়ছে, কিন্তু যা বৃদ্ধি পায় তা অবশ্যই কমতে পারে, এবং তাই তিনি তার প্রাথমিক বিনিয়োগ দ্বিগুণ করে টাকা উত্তোলন করেন । শীঘ্রই গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে যে কোম্পানিটি দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য শুরু করতে চলেছে, যেখানে সমস্ত ধরণের সম্পদ পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে আছে। এটি খবরটি আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে এবং সকল শ্রেণীর মানুষ সাউথ সী কোম্পানির শেয়ার কিনতে লন্ডনে জড়ো হতে শুরু করে। লোকজনের কাছে ব্লান্ট ছিলেন একজন আর্থিক রসায়নবিদ যিনি ঋণকে সম্পদে রূপান্তরিত করার রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা তাদের বিছানার নিচ থেকে জীবন সঞ্চয় তুলে আনেন এবং তাদের ছেলে-ভাতিজাদের যতটা সম্ভব শেয়ার কিনতে পাঠান। বিষয়টি সকল শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যারা সাধারণত এই ধরণের কাজে জড়িত ছিলেন না।

আগের ফ্রান্সের মতো, দেশটি এখন এক অসাধারণ উত্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ২৮শে মে রাজা তার ষাটতম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন, এটি ছিল সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি, যেখানে বিশাল টবগুলি ক্ল্যারেট এবং শ্যাম্পেনে ভরা ছিল। পার্টিতে উপস্থিত একজন মহিলা তার পোশাকে ৫,০০০ ইউরোরও বেশি মূল্যের গয়না দিয়ে তার নতুন সম্পদের জাহির করেছিলেন। লন্ডনের সর্বত্র ধনী ব্যক্তিরা বাড়ি ভেঙে ফেলছিলেন এবং তার পরিবর্তে আরও বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি তৈরি করছিলেন। পোর্টার এবং পদাতিকরা তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যয়বহুল কোচ কিনছিল এবং তাদের নিজস্ব পোর্টার এবং পদাতিকদের ভাড়া করছিল । ধনী ও ক্ষমতাবানরা যখন গ্রীষ্মের মাসগুলিতে লন্ডন ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ব্লান্টের মেজাজ একেবারেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ব্লান্টের আত্মবিশ্বাস এবং উদ্বেগহীন ভাবনা তার মনে দাগ কেটেছিল, কিন্তু এর আড়ালে তিনি চিন্তিত বোধ করতে শুরু করেছিলেন। এমন অনেক কিছু ছিল যা তিনি আগে থেকে কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি অসাবধানতাবশত নতুন অনুমানমূলক উদ্যোগের একটি ঝড় তুলেছিলেন, যার মধ্যে কিছু বৈধ ধারণা জড়িত ছিল এবং কিছু স্পষ্টতই অযৌক্তিক ছিল ।

লোকেরা আকর্ষণ অনুভব করছিল এবং এই নতুন জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলিতে তাদের কিছু অর্থ বিনিয়োগ করছিল। পরবর্তীতে মানুষ নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে জমিতে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল। এর কারণে তারা সাউথ সী থেকে তাদের অর্থ উত্তোলন করা শুরু করে। ব্লান্ট নিজেও এই কাজটিই করছিলেন, জনসাধারণের অজান্তে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ফরাসিরা মিসিসিপি উদ্যোগের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের অর্থ সরিয়ে ফেলছিল; নগদ অর্থের অভাব দেখা দিয়েছিল এবং ফরাসি অর্থনীতি এখন হঠাৎ মন্দার কবলে পড়েছিল। এটি অবশ্যই লন্ডনকে প্রভাবিত করতো। গ্রীষ্মের ছুটি থেকে ফিরে আসার আগে, ব্লান্টকে পদক্ষেপ নিতে হতো। পার্লামেন্টের সাথে কাজ করে, তিনি ১৭২০ সালের বাবল আইন পাস করেন, যা রাজকীয় সনদের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন সমস্ত জয়েন্ট স্টক নিষিদ্ধ করে। এর ফলে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে। কিন্তু এই সমাধান এমন পরিণতি তৈরি করবে যা তিনি কল্পনাও করেননি। হাজার হাজার মানুষ এই নতুন ব্যবসায় তাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছিল, এবং যেহেতু এগুলি এখন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাই তাদের অর্থ ফেরত পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তাদের একমাত্র উপায় ছিল সাউথ সীর শেয়ার বিক্রি করা। যারা সাউথ সী শেয়ার কেনার জন্য ঋণ ব্যবহার করেছিলেন তাদের অনেকেই নিজেদেরকে এমন কিস্তির মুখোমুখি হতে দেখেছিলেন যা তারা আর বহন করতে পারতেন না। তারা অর্থ উত্তোলনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। সাউথ সী শেয়ারের দাম কমতে শুরু করে। সেই আগস্টে সাউথ সী হাউসের বাইরে ভিড় জমতে থাকে কারণ লোকেরা শেয়ার বিক্রি করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

আগস্টের শেষের দিকে, ব্লান্ট নিজেই মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি আবারও ১,০০০ ইউরোতে তার চতুর্থ টাকার সাবস্ক্রিপশন চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। এখন শর্তগুলি আগের চেয়ে আরও উন্নত ছিল, এবং তার উপরে তিনি ৩০ শতাংশের একটি আশ্চর্যজনকভাবে বড়দিনের(X-mas) লভ্যাংশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার পরে ৫০ শতাংশ বার্ষিক লভ্যাংশ আসবে। এই ধরণের লোভনীয় শর্তাবলীর দ্বারা কিছু লোককে এই প্রকল্পে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, যার মধ্যে স্যার আইজ্যাক নিউটন নিজেও ছিলেন। কিন্তু অন্যরা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে পুরো বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন: দক্ষিণ আমেরিকায় এখনও কোনও কিছুর জন্য লেনদেন হয়নি এমন একটি কোম্পানি, যার একমাত্র বাস্তব সম্পদ ছিল সরকার তার ঋণের উপর যে সুদ দিয়েছিল, কীভাবে এত বড় লভ্যাংশ বিতরণের চেষ্টা করতে পারে? এখন যা আলকেমি বা জাদুর মতো মনে হয়েছিল তা জনসাধারণের উপর একটি সরাসরি প্রতারণা বলে মনে হচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে বিক্রিআতঙ্কে পরিণত হয়েছিল, কারণ প্রায় সবাই কাগজের শেয়ারগুলিকে আসল জিনিসে, মুদ্রা বা ধাতুতে রূপান্তর করার জন্য ছুটে গিয়েছিল। টাকার আতঙ্ক যত তীব্র হচ্ছিল, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড প্রায় ভেঙে পড়ার দিকে যাচ্ছিল। মুদ্রা ফুরিয়ে যাওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছিল। ইংল্যান্ডে এখন স্পষ্ট ছিল যে উৎসব শেষ। আগস্টের শেষের দিকে, ব্লান্ট নিজেই মরিয়া হয়ে ওঠেন। হঠাৎ পতনের ফলে অনেকেই তাদের সম্পদ এবং জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে ফেলেছিলেন। আইজ্যাক নিউটন নিজেও প্রায় ২০,০০০ ইউরো হারিয়েছিলেন, এবং তারপর থেকে কেবল অর্থ বা ব্যাংকের কথা বললেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। লোকেরা যা কিছু পারে বিক্রিকরার চেষ্টা করছিল। শীঘ্রই আত্মহত্যার এক ঢেউ ওঠে, যার মধ্যে চার্লস ব্লান্ট,স্যার জনের ভাগ্নে ছিলেন, যিনি তার লোকসানের সঠিক ধরণ জানতে পেরে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন। ব্লান্ট নিজেই রাস্তায় তাড়া খেয়েছিলেন এবং প্রায় একজন আততায়ীর হাতে নিহত হতে হতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তাকে দ্রুত লন্ডন থেকে পালাতে হয়েছিল। তিনি তার বাকি জীবন বাথ শহরে কাটিয়েছিলেন, সাউথ সী স্কিমের মাধ্যমে পার্লামেন্ট তার উপার্জিত প্রায় সমস্ত অর্থ কেড়ে নেওয়ার পর থেকে তার তিনি খুব সাধারণ উপায়ে জীবন কাটাতেন।

জন ব্লান্ট ছিলেন একজন বাস্তববাদী, কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যবসায়ী যার একটাই লক্ষ্য ছিল - নিজের এবং তার পরিবারের জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জন করা। তবে, ১৭১৯ সালের গ্রীষ্মে, এই অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষটির এক ধরণের আগ্রহ হয়েছিল। যখন তিনি প্যারিসে কী ঘটছে তা পড়তে শুরু করেন, তখন তিনি সবকিছুর নাটকীয়তা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সাধারণ ফরাসিদের হঠাৎ করে ভাগ্য গড়ার প্রাণবন্ত গল্প পড়েন। তিনি এর আগে কখনও ভাবেননি যে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিতে বিনিয়োগ এত দ্রুত ফলাফল দিতে পারে, তবে ফ্রান্স থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ অকাট্য ছিল। তিনি ইংল্যান্ডেও একই রকম সৌভাগ্য আনতে চেয়েছিলেন এবং তার পরিকল্পনা তৈরিতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই লো'র পরিকল্পনার অনেক বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেছিলেন, এর পরিধি বাড়িয়েছিলেন। তবে এখানে আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন তার মনে কখনও আসেনি। এই পরিকল্পনাটি শেয়ারের দাম বৃদ্ধির উপর নির্ভর করবে। যারা তাদের সরকারি আইওইউগুলিকে শেয়ারে রূপান্তরিত করেছিল, তাদের যদি ১০০ ইউরোর পরিবর্তে ২০০ ইউরো প্রতি শেয়ার দিতে হত, তাহলে তারা কম শেয়ার পেত, যার ফলে সাউথ সী-এর কাছে আরও বেশি শেয়ার জনসাধারণের কাছে বিক্রিকরে ভালো মুনাফা অর্জন করা

যেত। যদি ২০০ ইউরোতে শেয়ার কেনা হত, তাহলে দাম বাড়তে থাকলে এবং কোনও সময়ে বিক্রিহলে তাদের মূল্য আরও বেশি হত। দাম বৃদ্ধি দেখে আরও ঋণদাতারা তাদের শেয়ার রূপান্তর করত এবং আরও বেশি লোককে কিনতে আকৃষ্ট করত।

দাম বাড়তে থাকলে সকলেই জিততো। কিন্তু যদি বাণিজ্যের মতো কোন প্রকৃত সম্পদের উপর ভিত্তি করে না হত, তাহলে কীভাবে দাম বাড়তে থাকত? যদি দাম অনিবার্যভাবে কমতে শুরু করত, তাহলে অবশ্যই আতঙ্ক তৈরি হত, কারণ মানুষ এই প্রকল্পের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত। ব্লান্ট কেন এটি আগে থেকে কল্পনা করতে পারেন নি? উত্তরটি সাধারণ।

ব্লান্টের মানসিক সময় ফ্রেম এমন পর্যায়ে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল যেখানে তিনি কয়েক মাস ধরে রাস্তার দিকে তাকানোর এবং পরিণতি বিবেচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফ্রান্সের ঘটনাবলী দেখে মুগ্ধ হন এবং তিনি যে সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন তা কল্পনা করেন, তিনি কেবল বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন, যাতে প্রকল্পটি সফলভাবে চালু হয় তা নিশ্চিত করা যায়। এর প্রাথমিক সাফল্য তাকে কেবল কল্পনা করতে বাধ্য করেছিল যে এটি দীর্ঘ সময় ধরে এইভাবে চলবে। এটি যত এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে আরও দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং এটি করার একমাত্র উপায় ছিল ঋণের মাধ্যমে আরও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা।

যখন মানুষ তাদের কর্ম এবং তাদের পরিণতির মধ্যে সংযোগ হারিয়ে ফেলে, তখন তারা বাস্তবতার উপর তাদের আধিপত্য হারিয়ে ফেলে, এবং এটি যত এগিয়ে যায় ততই এটি পাগলামির মতো মনে হয়। ব্লান্টের উপর যে উন্মাদনা কাটিয়ে উঠেছিল তা শীঘ্রই রাজা, সংসদ এবং অবশেষে তাদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত নাগরিকদের একটি সমগ্র জাতিকে সংক্রামিত করে। ইংরেজেরা যখন তাদের স্বদেশীদের প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে দেখল, তখন এটি একটি বাস্তবতা হয়ে উঠল – এই পরিকল্পনাটি সফল হতেই হবে। তারা কয়েকমাস আগে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। যুক্তিবাদের প্রতিমূর্তি স্যার আইজ্যাক নিউটনের কী হয়েছিল তা দেখুন। শুরুতে তিনিও বিনিয়োগের জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তিনি প্রকল্পের ফাঁকগুলি দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাই তিনি তার শেয়ার বিক্রিকরে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি অন্যদের তার ১৪,০০০ ইউরোর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করতে দেখেন এবং এটি তাকে বিরক্ত করে। আগস্টের মধ্যে তিনি আবার বিনিয়োগ করেছিলেন, যদিও এটি পুনঃবিনিয়োগের সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল। স্যার আইজ্যাক নিউটন নিজেই চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের যা প্রদান করে, সেগুলোর মধ্যেই যদি আমাদের চিন্তাভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে আমাদের যুক্তিশক্তি তখন নিরপেক্ষ হয়ে যায়। আমাদের একমাত্র প্রতিষেধক হলো তাৎক্ষণিক ঘটনার তাৎক্ষণিকতা থেকে নিজেদেরকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন রাখা এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করা এবং সর্বদা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি মনে রাখা।

*I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people.*

*---- Sir Issac Newton*

১০

# মানুষের সাথে মেলামেশা

হাই স্কুলে থাকাকালীন, টম তার পাড়ার কিছু ছেলের সাথে অনেক সময় কাটিয়েছে। টমের মতে, সেই ছেলেরা কেবল সামনের বারান্দায় বসে গাড়ির যাতায়াত দেখতে পছন্দ করত। তাদের কোনও লক্ষ্য ও স্বপ্ন ছিল না। তারা সবসময় নেতিবাচক ছিল। টম যখনই তাদের নতুন কিছু করার পরামর্শ দিত, অন্যরা তাকে নিরুৎসাহিত করত। 'এটা বোকামি' অথবা 'ভালো নয়' তারা তাকে বলত। টম কেবল তাদের সাথে মিশতো, যাতে সে দলের অংশ থাকতে পারে। টম যখন কলেজে গিয়েছিল, সেখানেও কিছু নেতিবাচক লোক ছিল।

কিন্তু সে এমন লোকদেরও সাক্ষাত পেয়েছিল যারা ইতিবাচক ছিল, যারা শিখতে চেয়েছিল, যারা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিল। টম ইতিবাচক মানুষদের সাথে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কয়েকদিন পর টম নিজের সম্পর্কে অনেক ভালো বোধ করতে শুরু করলো। সে একটি দুর্দান্ত মনোভাব গড়ে তুললো। সে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে শুরু করলো। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। টম এখন তার নিজস্ব সফল ভিডিও প্রযোজনা সংস্থা চালায় এবং তার একটি চমৎকার পরিবার রয়েছে।

যখন টমকে জিজ্ঞাসা করা হলো তার হাই স্কুলের বন্ধুদের কী হয়েছে, তখন সে বলল, 'তারা এখনও একই পাড়ায় থাকে। তারা এখনও নেতিবাচক। এবং তারা এখনও তাদের জীবনে কিছুই করছে না।'
টম আরও বলল, 'আমি যদি ঐ লোকদের সাথে আড্ডা দিতে থাকতাম তবে আমি কখনই এই জায়গায় থাকতাম না। আমি এখনও সেখানে পিন-বল খেলতাম।'

টমের গল্প আমাদের জীবনে অন্যদের প্রভাব সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত স্মারক। তবুও কখনও কখনও আমরা কিছু নির্দিষ্ট লোকের সাথে থাকার অভ্যাস করি – এবং আমরা এর পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করি না। 'আপনি কার সাথে আড্ডা দেন বলেন, আমি বলে দিতে পারবো আপনি কে' এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটি কি কখনও শুনেছেন? এই সহজ উক্তিতে অনেক জ্ঞান নিহিত আছে। এই নীতিটি কীভাবে আপনার জীবনকে গড়ে তুলছে এবং রূপ দিচ্ছে তা নিয়ে কি আপনি ভেবে দেখেছেন? আপনি যখন বড় হচ্ছিলেন, সেই সময়ের কথা ভাবেন। আপনার কি মনে আছে আমাদের বাবা-মা কার সাথে আপনি আড্ডা দিতেন তা নিয়ে কতটা চিন্তিত ছিলেন? আমাদের মা-বাবা আমাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের সম্পর্কে সব ধরণের তথ্য জানতে চাইতেন। কেন ? আমাদের বাবা-মা জানতেন যে আমরা আমাদের বন্ধুদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হব… যে আমরা তাদের কিছু অভ্যাস বেছে নেব। আমাদের বাবা-মা সঙ্গত কারণেই চিন্তিত ছিলেন। এবং আমি নিশ্চিত যে যদি আপনার সন্তান থাকে, তাহলে আপনি তাদের বন্ধুদের উপর খুব মনোযোগ দেন – কারণ এই বন্ধুরা আপনার সন্তানদের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে এ নিয়ে আপনি চিন্তিত।

আজকের দিনে আমরা '*টক্সিক পিপল*' এবং '*নরিশিং পিপল*' এই দুই শব্দ দেখতে পাই। টক্সিক পিপল সর্বদা নেতিবাচক বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। তারা ক্রমাগত তাদের মৌখিক বিষ উগরে দেয়। নরিশিং পিপল হচ্ছে ইতিবাচক ও সহায়ক। তারা আপনার মনোবলকে বাড়িয়ে দেয়, এবং আপনার চারিপাশে আনন্দ নিয়ে আসে। টক্সিক লোকেরা সবসময় আপনাকে তাদের স্তরে টেনে নামানোর চেষ্টা করবে। আপনি যা করতে পারেন না এবং যা অসম্ভব, সেসব দিয়ে তারা আপনার উপর আঘাত হানবে। তারা খারাপ অর্থনীতি, তাদের জীবনের সমস্যা, আপনার জীবনে শীঘ্রই আসন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যতের ভয়াবহ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিষণ্ণ বক্তব্য দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করবে। যদি আপনি ভাগ্যবান হন, তাহলে তারা তাদের ব্যথা এবং যন্ত্রণা সম্পর্কে কিছু কথাও বলতে পারে। টক্সিক মানুষদের কাছে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর, আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন। মোটিভেশনাল স্পিকার লেস ব্রাউন এই মানুষদের 'ড্রিম কিলার' বলে উল্লেখ করেছেন। মনোবিজ্ঞানী জ্যাক ক্যানফিল্ড তাদের 'এনার্জি ভ্যাম্পায়ার' হিসেবে বর্ণনা করেন কারণ তারা আপনার সমস্ত ইতিবাচক শক্তি চুষে নেয়।

আপনি কি কখনও একজন নেতিবাচক ব্যক্তির সাথে সময় কাটিয়েছেন – এবং অনুভব করেছেন যেন সেই ব্যক্তি শারীরিকভাবে আপনার থেকে শক্তি নিচ্ছে? আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। একটি জিনিস নিশ্চিত: টক্সিক লোকেদের সাথে সময় কাটান তাহলে তাদের নেতিবাচক বার্তাগুলি আপনাকে হতাশ করে দেবে।
অন্যদিকে, আপনি যখন ইতিবাচক, উৎসাহী এবং সমর্থনকারী এমন লোকদের মধ্যে থাকেন তখন আপনি কেমন অনুভব করেন? আপনি উজ্জীবিত এবং অনুপ্রাণিত অনুভব করেন । ইতিবাচক মানুষের মধ্যে সত্যিই আশ্চর্যজনক কিছু আছে। তাদের কাছে এমন একটি ইতিবাচক শক্তি থাকে যা পুরো ঘর আলোকিত করে। আপনি যখন তাদের আশেপাশে থাকেন, তখন আপনি তাদের মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন এবং আপনি মনে করেন যেন আপনি আপনার নিজের লক্ষ্যগুলিকে জোরালোভাবে অনুসরণ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করেছেন।

আমি নিশ্চিত এটা আপনার সাথে অনেকবার ঘটেছে। আমি নিশ্চিত আপনার সাথেও এটা অনেকবার ঘটেছে। আপনি রেডিওতে একটা গান শুনলেন, আর নিজেকে বললেন, 'কি হাস্যকর গান' ।  সেদিনের পরে, আপনি আবার একই গান শুনতে পান । পরের দিন, আপনি আরও কয়েকবার সেই গানটি শুনতে পান । গানটি যখন চার্টে উঠে যায়, তখন আপনি আর এড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনি এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন কয়েকবার এটি শুনতে পান । তারপর অবিশ্বাস্য কিছু ঘটে। আপনি  ঘরে বসে আছেন এবং হঠাৎ করেই আপনি সেই বোকা গানটি গুনগুন করতে শুরু করেন বা গাইতে শুরু করেন । সে মুহূর্তে যদি আপনাকে জিজ্ঞসা করা হয়, যে গানটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আপনি বলবেন, 'ভয়ানক' । তাহলে কেন আপনি গানটি গাইছেন? বাস্তবতা হল, তুমি যা বারবার শুনবেন তা আপনার চেতনার সামনে থাকবে। আপনি  জানেন যে, একবার সেই গানটি কম জনপ্রিয় হয়ে উঠলে,  রেডিওতে  ঘন ঘন বাজানো না হলে, আপনি এটি সম্পর্কে প্রায়ই কম ভাববেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে । মন যা বারবার পুনরাবৃত্তি হয় তা নিয়েই চিন্তা করতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত মন আমাদের জন্য কোন বার্তা ভালো এবং কোন বার্তা ক্ষতিকর তার মধ্যে পার্থক্য করে না। আমরা যদি বারবার কিছু শুনি, তাহলে আমরা তা বিশ্বাস করতে শুরু করি এবং তার উপর কাজ করা শুরু করি । ঠিক যেমন একটি গান বারবার পুনরাবৃত্তি করলে আমরা সেই গানটি নিয়ে ভাবি, তেমনি সাফল্যের কথা বারবার ভাবলে আমরা সাফল্যের কথা চিন্তা করতে থাকি । তাই  আমাদের মনকে ইতিবাচক বার্তা দিয়ে পূর্ণ করা  উচিৎ, তাহলে আমরা আরও ইতিবাচক হয়ে উঠব এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাহসের সাথে এগিয়ে যাব।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সময়ে সময়ে আপনার বন্ধুত্বের মূল্যায়ন করুন – এমনকি যেগুলি আপনি বহু বছর ধরে বজায় রেখেছেন। বিশ্বাস করেন, এটা কোন ছোটখাটো বিষয় নয়। যারা আপনার সময় নষ্ট করে তারা আপনার সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ – আপনার মনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে । আপনি কি নিজেকে নেতিবাচক বন্ধুদের সাথে ঘিরে রেখেছেন এবং অবসর সময়ে তাদের সাথে অনেক সময় ব্যয় করছেন ? যদি তাই হয়, আমি আপনাকে এই লোকেদের সাথে অনেক কম সময় কাটানোর বিষয়ে ভাবতে বলব –  তাদের সাথে একেবারেই সময় না কাটানো বেশি ভালো । এটা কঠিন শোনাচ্ছে, তাই না?

যদি আপনার আত্মীয়স্বজন টক্সিক হয়, তাহলে আপনি কী করবেন? স্পষ্টতই, এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আমি আপনাকে যা পরামর্শ দিতে যাচ্ছি তা হলো, আপনার পরিবারের সদস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। পারিবারিক বন্ধন মূল্যবান, এবং আমি মনে করি আমাদের অবশ্যই পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেস্টা করতে হবে। তবুও আমি আপনাকে কিছু নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি যা আপনার জীবনের উপর আপনার টক্সিক আত্মীয়দের প্রভাব কমিয়ে আনবে। আপনি তাদের ত্যাগ করছেন না বা তাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করছেন না, বরং আপনি তাদের সাথে আপনার সম্পৃক্ততার উপর কিছু সীমা আরোপ করছেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার নেতিবাচক আত্মীয় থাকে, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি যদি জানেন যে তারা আপনাকে হতাশ করবে বা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের সমালোচনা করবে তবে প্রতিদিন তাদের সাথে ফোনে ঘন ঘন কথা বলবেন না।

নরিশিং মানুষদের সাথে আপনার মেলামেশা বাড়ানোর সাথে সাথে আপনি নিজের সম্পর্কে আরও ভালো বোধ করবেন এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন শক্তি পাবেন। আপনি আরও ইতিবাচক, অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তি হয়ে উঠবেন – যে ধরণের মানুষের আশেপাশে  অন্যরা থাকতে পছন্দ করে। তাই নিজেকে ইতিবাচক,  মানুষদের সাথে ঘিরে রাখুন – তারা আপনাকে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে তুলবে।

*A mirror reflects a man's face, but what he is really like is shown by the kind of friends he chooses.*

*---- The Living Bible, Proverbs 27*